স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ৩১ ডিসেম্বর - ২০১২।। ১৫ পৌষ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

১১৫/১৮২

গুজরাটে নরেন্দ্র মোদির হ্যাটট্রিক

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬
গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী শুধু একজন বিজেপি
মুখ্যমন্ত্রীই নন — জননেতাও □ ৭
গৌতম দেব-সূর্য মিশ্রের লড়াইয়ে সমর্থন যোগাচ্ছে বিমান-বুদ্ধ! □ ৮
গুজরাত নির্বাচন : মহাভারতীয় রাজনীতির
গতিমুখ □ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ৯
খোলা চিঠি : না, না, না, তৃণমূল আর বরযাত্রী যাবে না □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের সঙ্গে
দায়িত্বের মেলবন্ধন ঘটেনি □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২
গুজরাট আজ যা ভাবে.... □ দীনেশ চন্দ্র সিংহ □ ১৪
গুজরাটে আবার নরেন্দ্র দামোদর মোদী তথা
ভারতীয় জনতা পার্টি □ অমলেশ মিশ্র □ ১৬
মোদীর গুজরাট জয় : পরিসংখ্যানের নিরিখে □ ১৮
টুলো পণ্ডিত □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদামণি □ অর্ণব নাগ □ ২২
সাংবিধানিক পদে সজ্জনরা আসুন □ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা □ ২৭
জাল নোটের কারবার মালদা প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছে □ ২৯
ভোটের স্বার্থে বোড়োদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে গগৈ সরকার □ ৩০
বাংলাদেশে হিন্দুদের মনোবল এখনও অটুট □ ৩১
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □
অন্যরকম : ৩৩ □ □ সু-স্বাস্থ্য : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭
□ □ খেলা : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

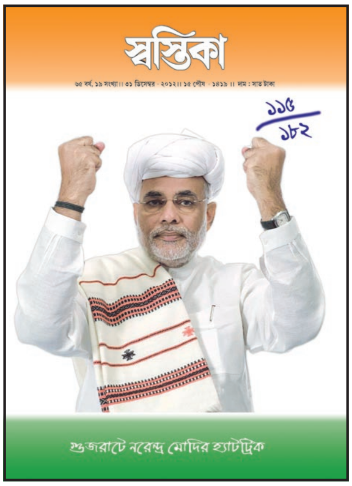

গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর হ্যাটট্রিক
পৃঃ- ৯-১০, ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৫ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ৩১ ডিসেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা

ভারতবর্ষ এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ওঠ! জাগ! লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত এগিয়ে চল।' পরাধীন জাতির নিদ্রা ভাঙ্গাতে তাঁর লক্ষ্য ছিল যুবকরা। দেশের সেই সুপ্ত অবস্থা আজও কাটেনি। 'তাই বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের পুণ্যলগ্নে একদিকে যখন ভারতাত্মার জয়গানে মুখরিত হচ্ছে বিশ্ববাসী, অন্যদিকে তখন দেশ ডুবে যাচ্ছে দুর্নীতি আর মিথ্যাচারের পঙ্কে। স্বামীজী'র জীবন ও বাণী কি তবে বিফলে যাবে? কিন্তু তা তো হবার নয়। দেশের নাম যে ভারতবর্ষ। তাকে তো ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। স্বামীজীর জন্মের দেড়শো বছরে স্বস্তিকার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। লিখছেন : অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ, ড. অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যনারায়ণ রাও, গোপালকৃষ্ণ রায়, রমাপ্রসাদ দত্ত ও আরও অনেকে।

দাম একই থাকছে— সাত টাকা

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যা

২০১৩ সালের ১১, ১২, ও ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশত উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নদীয়ার কল্যাণী শহরের উপকণ্ঠে গয়েশপুরে অনুষ্ঠিতব্য বিবেকানন্দ যুব শিবির আক্ষরিক অর্থেই বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। সমাজে এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে তাই-ই আমাদের আলোচ্য। রঙিন চিত্র সম্বলিত অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র যুব শিবিরে যোগদানকারীদেরই নয়, প্রতিটি বিবেকানন্দ-অনুরাগী মানুষের জন্যও সংরক্ষণযোগ্য।

।। তারিখের মধ্যে কপি বুক করুন।। মূল্য ১০ টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

লজ্জায় মুখ ঢাকছে, কিন্তু তারপর?

এক সপ্তাহ আগে রাজধানী দিল্লীসহ দেশের অন্যান্য শহরের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ, বিশেষত যুবক-যুবতীরা নামিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকদিন আগে চলন্ত বাসে তেইশ বছরের এক যুবতীকে ধর্ষণ করিবার বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেই তাহাদের এই আন্দোলন। পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও জল-কামানের আঘাত সহ্য করিয়াই তাহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। জানাইয়াছে, পুলিশের কাঁদানে-বোমার প্রয়োজন নাই। তাহাদের চোখ এমনিতেই অশ্রুসিক্ত। বস্তুত এই বিক্ষোভের মধ্যে শুধুই যে রাগ আছে তাহা নহে, আছে মানুষের বেদনা। তাহাদের বার্তা অতি স্পষ্ট—মহিলাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম অপরাধ সহ্য করা হইবে না।

প্রতিবাদী বিক্ষোভ যেখানে পৌঁছিয়াছে, তাহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিণাম নয়, তাহা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং ক্রোধের প্রকাশ। এই ক্রোধ কোনও একটি সরকার বা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, ইহা রাষ্ট্রের সামগ্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নাগরিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তার নিশ্চিত করিতে অক্ষম। রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইহা একটি চ্যালেঞ্জ। যে সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ষণ করিলে শাস্তি হয় না। ধনী চিত্রতারকা আইন ভাঙিয়া বিরল প্রজাতির প্রাণীকে হত্যা করিলে শাস্তি হয় না। বি এম ডব্লিউ গাড়ি চালাইয়া পথচারীকে হত্যা করা যায়। এবং সেই অক্ষমতা লইয়া যাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অনুশোচনা নাই। তাই এই নাগরিক ক্ষোভের বিস্ফোরণ স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে আরও কীভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং সেইসঙ্গে আরও ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী করা করা যাইতে পারে তাহা লইয়া ভাবনা-চিন্তার সময় আসিয়াছে। যদি আমরা এই সুযোগটিকে কাজে লাগাইয়া মহিলাদের সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক পরিবর্তন না আনিতে পারি তবে তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। আমরা চাই অপরাধীদের এমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হউক যাহা মহিলাদের সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত হইবে। এই নির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। এমন একটি সার্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাহাতে মহিলারা নিরাপত্তা ও মর্যাদা বোধ করে।

বর্তমান এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়ার দাবীর স্লোগানই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়টি লইয়া আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন, বিশেষত মহিলাদের এক শ্রেণীই যখন বলিতেছেন এই শাস্তি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। অপরাধীরা যদি জানে যে তাহার অপরাধের শাস্তি মৃত্যু হইতে পারে তবে তাহা হইতে মুক্তির জন্য তাহার বিরুদ্ধে সব থেকে শক্তিশালী সাক্ষী— ধর্ষিতাকেই হত্যা করিবে। এই প্রসঙ্গে কোনও কোনও মহল হইতে অপরাধীর জননশক্তি নষ্ট (Chemical castration) করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহাতে আর কখনও সে বিকৃত কাম লালসা চরিতার্থ না করিতে পারে। অন্য ভাবে বলা যায়, অপরাধীকে হিজরা (namard) করিবার প্রক্রিয়া আমাদের সমাজে একটি কঠোর শাস্তি হিসাবে গণ্য। শাস্তির এইসব বিধানের সঙ্গে আদালতে দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। উল্লেখ্য দিল্লী পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র দেশে এই মুহূর্তে ৪২,৮৪৯টি ধর্ষণের মামলা বিচারকের অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। অপরাধীরা কবে শাস্তি পাইবে তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানিতে পারেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য সবরকমের সম্ভাব্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইসব অপরাধের বিচার যাহাতে দ্রুত হয় এবং এমন কঠোর শাস্তিবিধান থাকিবে যাহাতে লোকেদের সব সময়ে মনে থাকিবে এই ধরনের অপরাধের জন্য কী কঠিন মূল্য দিতে হইবে।

ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির মতো অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনে পরিকাঠামোর আরও উন্নতি ও মহিলা পুলিশের প্রয়োজন। এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের অধস্তনদেরকে সচেতন করিতে হইবে। পুলিশ এই অপরাধ দমনে তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও আমাদেরও কিছু কাজ থাকিয়া যায়। কোনও মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা বা নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য দেখিলেই অবিলম্বে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাইতে হইবে। এই সহজ উপায়টা আমরা যদি নিজেরাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, তাহা হইলে সফদরজং হাসপাতালে যে মহিলাটি বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের জন্য সমাজে ‘নির্ভয়’-এর পরিবেশ সৃষ্টি হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ’লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে কিন্তু এ কি সম্ভব?

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতির বিবেকানন্দ শারদ পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের স্বাভিমানবোধ ও অস্মিতা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তার যোগ্য হয়ে উঠিনি। আমাদের দাসমনোবৃত্তি— চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতা কবে শেষ হবে জানি না। আজ এই মহান স্বাভিমান বোধ ও অস্মিতা খুব প্রয়োজন। গত ২১ ডিসেম্বর কলকাতায় 'বিবেকানন্দ শারদ পুরস্কার ২০১২' অনুষ্ঠানে এই কথাগুলি বলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ আয়োজন সমিতি— পূর্বক্ষেত্র।

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) অশোক আইকট, কিশোর টকেকর, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। — ছবি : শিবু ঘোষ

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি অশোক আইকট। সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান সমিতির সংযোজক অরবিন্দ দাশ।

সমিতির সর্বভারতীয় সংযোজক কিশোর টকেকর আগামী কার্যসূচীর কথা তুলে ধরেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমিতির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেন। এ বছর (২০১২) দুর্গাপুজায় স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের যেসব পূজা কমিটি তাদের মণ্ডপ ইত্যাদি করেছিল, আয়োজন সমিতির পক্ষ থেকে তাদের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটিকে 'বিবেকানন্দ শারদ পুরস্কার-২০১২' দেওয়া হয়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর সরস বাচনভঙ্গিতে স্বামীজীর কথা তুলে ধরে সকলকে মুগ্ধ করেন। বিবেকানন্দ অনুরাগীদের উপস্থিতিতে সভাঘর ছিল পরিপূর্ণ। সমিতির তরফে সকলকে ধন্যবাদ জানান বুদ্ধদেব মণ্ডল।

কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনে অভিযুক্ত হিমাচল প্রদেশের নবনির্বাচিত কংগ্রেসী বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কারা এবার সরকার গড়বে তা ইতিমধ্যে হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে হিমাচল প্রদেশের জনগণ। শুরু হয়ে গেছে অনুতাপের পালা। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বীরভদ্র সিং সোনিয়ার আশীর্বাদে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন এটা সকলেরই জানা। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নবনির্বাচিত বিধায়কেরাও যে একেকজন রত্ন তা অনেকেরই জানা ছিল না। সদ্য প্রকাশিত হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে দুন থেকে জয়লাভ করেছেন রামকুমার চৌধুরী। হরিয়ানা সীমান্তের বাড্ডি এলাকার এই বিধায়ক জনপ্রতিনিধি হয়েও পুলিশের খাতায় এই মুহূর্তে ফেরার আসামী। তাঁর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর অঞ্চলের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনায় রামকুমারের পাশাপাশি অভিযুক্ত আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর মৃত পাঞ্জাবের ওই কিশোরীর দেহ হিমাচলপ্রদেশের পাঁচকুলা থেকে উদ্ধার হয়েছিল। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে মাথায় ভারী আঘাতের চিহ্ন এবং ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এর পরেই ওই খুনের সঙ্গে ওই বিধায়কের জড়িত থাকার বিষয়টি পুলিশি তদন্তে উঠে আসে। তারপর থেকেই বেপাত্তা হিমাচল প্রদেশের দুনের ওই কংগ্রেসী বিধায়ক। রামকুমার চৌধুরী কেবল বিধায়ক নন, তিনি হিমাচল প্রদেশ কংগ্রেসের একজন সম্পাদকও। তাই এইসব কারণে পুলিশ তদন্তে ঢিলেমি করছে, এই অভিযোগ এনে মৃত কিশোরীর বাবা বুটিরাম জানিয়েছেন; অভিযুক্তদের তরফ থেকে টাকা দিয়ে অভিযোগ তুলে নিতে বলা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি টাকা চান না, দোষীদের প্রকৃত সাজা চান।

পরলোকে অহীন্দ্রকুমার দে

মালদা জেলার সঙ্ঘের প্রথম দিককার স্বয়ংসেবক অহীন্দ্রকুমার দে (জয়দেবদা) গত ২২ ডিসেম্বর রাত ৮-৩০ মিনিটে পরলোক গমন করেছেন। বলা যায়, বাংলায় সঙ্ঘের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সূত্রে ১৯৪৬ সালে প্রথম তিনি শাখায় আসেন। তারপর ১৯৫৮ সালে নবদ্বীপে প্রচারক জীবন শুরু করেন। ১১ বছর তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচারক ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি সঙ্ঘের বিভাগ সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সঙ্ঘের গানের বই 'বন্দনা'র অনেক গান তাঁর লেখা এবং সুরও তাঁর দেওয়া। এছাড়া হিন্দুত্বের উপর তার বহু বই ও প্রবন্ধ আছে। তিনি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবনে শিক্ষকতা করেছেন এবং অবসর নেওয়ার পরও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা-কে রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই বছর জানুয়ারি মাসে তাঁর ও তুষারকান্তি ঘোষের লেখা দেশাত্মবোধক গানের ক্যাসেট 'দেশের আকাশ দেশের বাতাস'-এর উদ্বোধন হয়।

গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী শুধু একজন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীই নন— জননেতাও

পরপর পাঁচবার গুজরাটে ক্ষমতা ধরে রাখলো ভারতীয় জনতা পার্টি। এই পাঁচবারের মধ্যে শেষ তিনবার নির্বাচনে জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তাই একটা কথা দেশের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্মরণে রাখা উচিত যে নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত 'ক্যারিশ্মা' বা জনসম্মোহিনী শক্তিতেই গুজরাটে বিজেপি-র সাফল্য এসেছে তা ঠিক নয়। তাঁর রাজনীতিতে আসার আগেও বিজেপি গুজরাটে নির্বাচনে জিতেছে। তবে মানতেই হবে মোদীর সুশাসন গুজরাটে বিজেপি-র জনপ্রিয়তাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। গুজরাটের মানুষ বিশ্বাস করেছেন, নরেন্দ্র মোদী যে কথা বলেন তা বাস্তবে করে দেখান। অসত্য, অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেন না। যেমন স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন রাজ্যের হতাশ মানুষজনকে দেখান। বাংলার মানুষ তখন আর নেত্রীর কথা বিশ্বাস করেন না। মানুষ জেনে গেছে, সামনে মে মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এইসব উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনে জেতার জন্য। নির্বাচন শেষ হলে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলিরও অকাল মৃত্যু ঘটবে। গুজরাটের চিত্র ভিন্ন। নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনে জেতার অসত্য প্রতিশ্রুতি দেন না। তাই মোদী ভারতের 'রোল মডেল অব ডেভেলাপমেন্ট'। এমন একজন রোল মডেল বা আদর্শ পুরুষ যিনি নিজেকে প্রচারের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। যিনি টুইটারে লেখেন, 'আমি নই, আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি বলেই সাফল্য আসে। গুজরাটের উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও রাজনৈতিক ভেদাভেদ নেই।' এখানেই গুজরাটের কাছে পশ্চিমবঙ্গ গোহারা হেরেছে। এখানে ধর্ষণ থেকে উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে 'আমরা মা- মাটি-মানুষের সরকার 'আমরা-ওরা' ভেদাভেদকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার জেরে গুজরাটে ২০০২ এবং ২০০৭ সালে নরেন্দ্র মোদী মিডিয়ার চোখে ছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী খলনেতা। হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনে প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেসও মিডিয়ার এই প্রচারকেই হাতিয়ার করে ময়দানে নেমেছিল। অন্যদিকে উন্নয়ন ও গুজরাটি অস্মিতাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের প্রচারের মোকাবিলা করেছিলেন মোদী। আরও একটি কাজ নিঃশব্দে করেছিলেন। রাজ্যের সংখ্যালঘুদের দাঙ্গার ক্ষতে প্রলেপ দিতে তিনি তাঁর প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণে অগ্রাধিকার দিতে হবে মুসলিম প্রধান

গূঢ়পুরুষের

কলম

জেলাগুলিতে। নীট ফল, গুজরাটের মুসলিম প্রধান এলাকায় সবার আগে গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পাকা রাস্তা, শিল্প কারখানা। আমেদাবাদের কাছেই শিল্প তালুক 'সানন্দ' নামটি বাঙালির কাছে নতুন হলেও গুজরাটের মানুষের কাছে পরিচিত অনেক আগেই। 'সানন্দ' একটি রূক্ষ উষর ভূমির মুসলিম প্রধান গ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠী যখন ন্যানো গাড়ির কারখানা গুজরাটের 'সানন্দ'-তে সরিয়ে নিয়ে যায় তখনই মিডিয়ার সৌজন্যে এই একদা দরিদ্র অখ্যাত গ্রামটি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায়। অথচ টাটারা এখানে কারখানা গড়ার বহু বছর আগেই তিনটি মোটর গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা তাদের কারখানা সানন্দে চালু করেছে। একদা হতদরিদ্র গ্রাম 'সানন্দ' এখন সর্বাধুনিক ঝাঁ চকচকে শহর। কি নেই সেখানে। 'সানন্দ' একটি উদাহরণ মাত্র। সারা গুজরাটেই এমন অসংখ্য 'সানন্দ' ছড়িয়ে আছে। জন্মগতভাবেই গুজরাটিরা বণিক। ব্যবসা বাণিজ্য তাঁদের রক্তে আছে। ভারতের প্রধান শিল্পসংস্থাগুলির মালিক গুজরাটের ভূমিপুত্র। মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সকলেই গুজরাটে অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়েছেন। এই উন্নয়নেরই ফসল ঘরে তুলেছেন মোদী। পরপর দু'বার। ২০০৭ এবং ২০১২ সালের বিধানসভার নির্বাচনে উন্নয়নই ছিল প্রচারের হাতিয়ার। তার আগে ২০০২ সালের নির্বাচনে দাঙ্গা বিধ্বস্ত গুজরাট 'হিন্দুত্ব' ছিল বিজেপি-র হাতের তাস। গর্বের সঙ্গে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দাও। এই আহ্বানেই বাজি জিতেছিলেন মোদী। গুজরাটে বিজেপি-র ঝুলিতে জমা পড়েছিল ১২৭টি আসন।

দাঙ্গার পর কেটে গেছে পুরো একটি দশক। সবরমতীর ক্ষীণস্রোতে আর ভেসে যায় না কারোও লাশ। সবরমতী এখন স্বচ্ছতোয়া পবিত্র নদী। নদীর একধারে গড়ে উঠেছে সর্বসাধারণের জন্য বিনোদন পার্ক। শোনা যায় না সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উচ্চকিত স্বর। গুজরাটবাসী ভুলে যেতে চায় দাঙ্গার অন্ধকার রাতগুলি। বরং ২০০২-কে পিছনে ফেলে গুজরাট কীভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে সে কথাই শোনা যায় সাধারণ মানুষের মুখে। গত কয়েক বছর দেশজুড়ে আর্থিক মন্দার মধ্যেও গুজরাটে চোখে পড়ার মতো আর্থিক বৃদ্ধি, শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সেচের কাজে নর্মদার জল পৌঁছে দিতে পারা, স্বাস্থ্য ও পুর পরিষেবায় সাফল্য নরেন্দ্র মোদীকে মুখ্যমন্ত্রীর কুরশিতে গুজরাটের আম আদমি বসিয়েছেন। মোদী নিজেই বলেছেন, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু' একটা ভাল কাজ হয়তো করা যায়। কিন্তু রাজ্যজুড়ে উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য চাই আম আদমির সহযোগিতা। আমি নয়, গুজরাটে আমরা কাজ করি। ভবিষ্যতেও আমরাই কাজ করবো'। হ্যাঁ, এই অঙ্গীকারই এবার নির্বাচনে 'হ্যাটট্রিক' করতে সাহায্য করেছে। গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী একজন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নন। তিনি জননেতা। মাস্ লিডার। হিন্দু-মুসলমান সকলেরই নেতা। দেশের মিডিয়া তাঁকে যতই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক তকমা দিক না কেন, গুজরাটবাসীর চোখে তিনি অসাম্প্রদায়িক, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের বিশ্বাস, এমন কর্মযোগী, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ মুখ্যমন্ত্রী গুজরাট অতীতে কাউকে পায়নি।

এবারের নির্বাচনী প্রচারের ফেস্টুনেও ছিল মোদীর বাণী, 'অ্যান অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক ইজ গুডলাক ফর মি। আই পুট মাই সোল ইন্টু ইট। ইচ সাচ অপরচুনিটি ওপেনস্ দ্য গেটস্ ফর দি নেক্সট ওয়ান।' মিডিয়ার চোখে মুসলিম ঘাতক নরেন্দ্র মোদী, গুজরাটবাসীর চোখে প্রণম্য কর্মযোগী সন্ন্যাসী।

গৌতম দেব-সূর্য মিশ্রের লড়াইয়ে সমর্থন যোগাচ্ছে বিমান-বুদ্ধ!

নিশাকর সোম

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্-প্রস্তুতির জন্য সিপিএমের রাজ্য- কমিটির সভা হয়ে গেল। রিপোর্টে প্রকাশ যে, (১) কোনও জেলা-কমিটির সম্পাদক বুক ঠুকে বলতে পারলেন না যে তাঁদের জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। (২) হাজি রেজ্জাক মোল্লার রাজ্য কমিটির সভায় উপস্থিত না-হওয়ার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। রেজ্জাককে কৈফিয়ত তলবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসুকে। রাজ্য কমিটি সভায় পার্টিকে সক্রিয় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ জেলাতেই পার্টির নিচের তলার কর্মীরা ‘শীতঘুমে’ আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব-এর অভিমত হলো—‘নিষ্ক্রিয় সদস্যদের সরিয়ে দেওয়া দরকার।’ কিন্তু কলকাতা জেলা-কমিটির মত হলো তাদের সক্রিয় করার ‘অভিযান’ চালাতে হবে।

এবার রাজ্য-কমিটিতে ঋতব্রত ব্যানার্জি, তাপস সিন্‌হা এবং অতনু সাহাকে স্থায়ী আমন্ত্রিত অর্থাৎ রাজ্য-কমিটিতে গ্রহণ করা হলো। বিমানবাবু ঋতব্রতকে গৌতম দেবের পরিবর্তে পার্টির মুখপাত্র হিসাবে কাজে লাগাতে চান। অতনু সাহাকে ধীরে ধীরে পার্টির মুখপত্রের দায়িত্বে এনে সেখান থেকে মদন দত্তদের একচেটিয়া ক্ষমতা খর্ব করতে সচেষ্ট বিমান বসু।

এদিকে সিপিএমের মধ্যে গৌতম দেব এবং সূর্য মিশ্রের মধ্যে শীর্ষে ওঠার ‘প্রতিযোগিতা’ দেখা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা শব্দটি রাজ্য নেতৃত্বই ব্যবহার করে বলেছেন ‘ওটা ভাল’। আসলে সূর্য মিশ্রের জনপ্রিয়তা এবং প্রতিটি জেলায় গ্রহণযোগ্যতা দেখে বুদ্ধবাবু আগামী দিনে তাঁর অবস্থান টলমল হবে ভেবে গৌতম দেব-কে উস্‌কে দিচ্ছেন।

অপরদিকে গৌতম দেব-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক হওয়ার বিরুদ্ধে সূর্য মিশ্রকে পুরো সমর্থন জানাচ্ছেন বিমান বসু। সূর্য-কে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রকাশ কারাট সমর্থন জানাচ্ছেন। এক কথায় নিরুপম সেনকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর গুরুত্ব দিতে রাজি নয়।

ওদিকে হাজি রেজ্জাক মোল্লা রাজ্য কমিটির সভায় না গিয়ে সিদ্দিকুল্লাদের সঙ্গে গোপন সভায় লিপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন সিদ্দিকুল্লা তৃণমূলে থেকে আসা

সিপিএমের সদস্য। তৃণমূলের মন্ত্রী নূরে আলম চৌধুরী সিদ্দিকুল্লার ভাই। নূরে আলম চৌধুরী প্রয়াত মনসুর হবিবুল্লাহ-এর জামাতা। মনসুর হবিবুল্লাহ যখন আইনমন্ত্রী ছিলেন তখনই নূরে আলম চৌধুরী হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, মনসুর হবিবুল্লাহও হজে গিয়ে হাজি হয়েছিলেন! নূরে আলম চৌধুরীর বেগম অর্থাৎ মনসুর হবিবুল্লাহ-এর কন্যার সঙ্গে একটা জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই নূরে আলম সাহেব-এর সিপিএম ত্যাগ এবং তৃণমূলে যোগদান।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে সিপিএমের রাজ্য- কমিটি তা হলো যেখানে যেখানে সম্ভব নির্দল অথবা অন্য কোনও প্রার্থীকে তলায় তলায় সমর্থন করবে।

রাজ্য-রাজনীতির অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর ত্রিফলা কেলেঙ্কারির পর নিকাশি ব্যবস্থায় দু'টি সংস্থাকে বাতিল করা হয়েছে। সেখানেও নাকি দুর্নীতির গন্ধ উঠেছে। কলকাতা পুরসভার ত্রিফলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— তিনিই এসব করাচ্ছেন। তাহলে কি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মুখ্যমন্ত্রীর মুঠোয়? রাজ্যে শিল্প নিয়ে ঢক্কা নিনাদ দেখা যাচ্ছে--- অথচ দিল্লীর শিল্পপতিদের সভার মাঝখানেই হিরো গ্রুপের পবন মজুরাল চলে যান এবং বাইরে এসে বলেন— ‘পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প গড়ার কোনও প্রশ্ন নেই।’ রঘুনাথপুর থেকে সরে যাচ্ছে তিনটি ইস্পাত সংস্থা— (১) জয় বালাজি, (২) শ্যাম স্টিল, (৩) আধুনিক কর্পোরেশান।

রাজ্যের শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা তৃণমূলের আচরণ। বড় শিল্পের জন্য জমি নেই স্বীকার করছে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক। ভূমি দফতর-এর বক্তব্য একলপ্তে বিশাল পরিমাপের জমি পাওয়া দুস্কর। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রীরা শিক্ষিকাদের ২১ ঘণ্টা আটক করে রাখে। তাদের দাবি পাশ করাতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীও তাদের দাবিকে পরোক্ষে সমর্থন করে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘেরাও রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিলেন।

রাজ্যের ঘোর আর্থিক সংকট। শোনা যাচ্ছে যে কুড়ি হাজার কোটি টাকা রাজ্য-সরকার ঋণ সংগ্রহ করবে। এই আর্থিক সংকটের মধ্যে পালামেন্টারি সেক্রেটারি নিয়োগের ব্যবস্থা বিধানসভায় পাশ করিয়ে তৃণমূলের ভাঙন রোখার চেষ্টা হচ্ছে। এর আগে প্রতিটি দফতরে সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এক একটি দফতরের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল। এটাও সাংসদের তুষ্ট করে তৃণমূলের ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা।

এদিকে সোমেন মিত্রের সম্পর্কে নানান কথা চালু হয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘আমি লক্ষ্মণ রেখা কাকে বলে জানি।’ অর্থাৎ কতদূর তিনি যাবেন তিনি তা ঠিক করে ফেলেছেন। শোভনদেবও তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে তাঁর সপক্ষে গোষ্ঠী শক্তির সমাবেশ করছেন।

গুজরাত নির্বাচন : মহাভারতীয় রাজনীতির গতিমুখ

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

বোধকরি দ্বিতীয়বারের জন্য গুজরাত ভারতীয় রাজনীতির দিক নির্দেশিকা হতে চলেছে। গুজরাতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়লাভ (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আসনে) মোদীকে ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে দক্ষতাসম্পন্ন ও জনমোহিনী নেতার আসনে অভিষিক্ত করেছে। প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে গুজরাত ভারতের গণ জাতীয়তাবাদের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সবরমতির পথ ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে নতুন দিশা দেখিয়েছিল। আর ২০১২ সালে মোদীর ঐতিহাসিক বিজয় পথভ্রষ্ট ন্যায়নীতি বহির্ভুত জনবিরোধী রাজনীতির বিকল্প হিসাবে এক ইতিবাচক, গতিশীল রাষ্ট্র নির্মাণের দিক চিহ্নিত করেছে। একদিকে কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রের ক্ষমতালোভী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতি, অন্যদিকে জাতপাত ও আঞ্চলিকতার নিগড়ে ক্ষুদ্র স্বার্থে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলির আস্ফালন দুটিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। গুজরাতের মানুষ দুটি জাতীয় স্তরের দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি দলকে গ্রহণ করেছে। তাই গুজরাতের নির্বাচনের তাৎপর্য নিছক গুজরাতের আঞ্চলিক রাজনীতির আবর্তে নিবদ্ধ নয়, কাকে বেছে নিতে হবে তার ইঙ্গিত মিলেছে। বোধ করি কেশুভাই প্যাটেলর জি পি পি নির্বাচন যুদ্ধে না দাঁড়ালে অন্তত খান-পনের বেশি আসনে বিজেপি জয়যুক্ত হোত। আর কংগ্রেস অনেক আসনে অল্প মার্জিনে জিতে প্রাপ্ত আসন সংখ্যায় স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছে। এখন প্রশ্ন, কংগ্রেসের জমি কি টি এম সি, টি ডি পি, লালু, মুলায়ম, মায়াবতী প্রভৃতির কাছে গচ্ছিত রেখে দেশকে চোরাবালির মধ্যে নিমজ্জিত করা সমীচীন?

মোদীর জয়ে বিহ্বল হয়ে কংগ্রেস ও মিডিয়া এই জয়কে বিজেপি দলের জয় না বলে মোদীর ব্যক্তিগত জয় বলে তুলে ধরতে চাইছে। এর অর্থ হলো কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে মোদির ফাটল সৃষ্টি করা। মোদী অবশ্য মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় বিজেপি তাঁর মায়ের মতো। সন্তান হয়ে কি করে তিনি মায়ের বিরুদ্ধে যাবেন। এ কথা সত্য, মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বের ভূমিকা খাটো করে দেখা সমীচীন নয়। কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন ১৯৯৫ সাল থেকে গুজরাতে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত— এই সময় ধারবাহিকভাবে বিজেপি গুজরাতে ক্ষমতাসীন। এবারের নির্বাচনে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয় হলো— গুজরাতের মুসলমান সম্প্রদায়কে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করা যায়নি। কারণ গুজরাতের মুসলমান সম্প্রদায় দেখেছেন যে বিগত দশ বছর গুজরাতে তেমন কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধেনি। অর্থনৈতিক মানের দিক দিয়ে গুজরাতের মুসলমানদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের অনগ্রসরতা অনেক বেশি।

দেখেশুনে মনে হয় ২০০২ সালের গোধরা হাঙ্গামার প্রথম দিকে কংগ্রেস, মুসলমানদের হিংসার পথে প্ররোচিত করেছিল। তবে গোধরায় পাল্টা প্রতিরোধ ঘটেছিল। যেমনটি হয়েছিল ১৯৪৬ সালের আগস্ট কলকাতায়। সে সময়ের বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির প্ররোচনায় হাঙ্গামা বাঁধে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ ঘটায় দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষের জীবননাশ হয়। কিন্তু মোদী আর সুরাবর্দি দুজনের মধ্যে ফারাক সুস্পষ্ট। একজন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিলেন। আর অন্যজন পাল্টা প্রতিরোধ নির্মমভাবে দমন করেননি।

সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার গুজরাতে বিজেপির প্রচারাভিযানের আধার হিসাবে হিন্দুত্বের বদলে মোদীত্বর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে নিছক ধর্মীয় রাজনীতির একপেশে ক্ষেত্র থেকে সরে এসে মোদী এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। জাতীয় পরম্পরা ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে মোদী ভারতীয় ঐতিহ্য, বিকাশ ও গুজরাতের স্বাভিমান এই তিন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। এছাড়া নীতি, নেতৃত্ব ও সংগঠন এই তিন উপাদানের সুসংহত সমাবেশ ঘটেছে। হিন্দুত্ব ও বিজেপি থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে নয়, দল ও মতাদর্শকে তুলে ধরেছেন। ভঙ্গুর রাজনীতি বনাম সংহতির রাজনীতি এবারের গুজরাত

নির্বাচনের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভোটব্যাঙ্ককে টুকরো করে কৌশলে ক্ষমতায় আগমন। ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই গুজরাতে জাতি ও অঞ্চলের তারতম্যকে ব্যবহার করে কংগ্রেস ক্ষমতা আত্মসাৎ করে। নরেন্দ্র মোদীর পাল্টা রণকৌশলে সেই উদ্দেশ্য সফল হলো না। বি এস পি একই রকম কায়দায় নিম্নবর্ণের ভোটে কামড় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। **এবারকার গুজরাতের নির্বাচন ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত গুজরাতে বিগত এক শতক ধরে ভারতীয় রাজনীতির অভিমুখ উন্মোচিত করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, বিগত শতকে সত্তরের দশকে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে আর এখন তথাকথিত বহুত্ববাদের মুখোশে ভঙ্গুর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে গুজরাত ভারতীয় রাজনীতির দিক নির্দেশ করেছে।**

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গুজরাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বীক্ষণাগারে পরিণত হয়েছিল। নব্বই বছর আগে গুজরাতের সন্তান মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গুজরাতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেন। নীতি ও নেতৃত্ব দুদিক থেকেই গান্ধীজী বিকল্প পথের সন্ধান দিলেন। গান্ধীজী পাশ্চাত্যকরণের বিপরীতে ভারতীয় ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক সংগ্রামের ভিত্তি হলো সত্যাগ্রহ। দ্বিতীয়ত, সাধারণ ভারতবাসীকে গণআন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত করলেন। ১৯২০ সালের পর গান্ধীজী হয়ে উঠলেন জাতীয় আন্দোলনের জনগণমন অধিনায়ক। গান্ধীজীর সুযোগ্য অনুগামী গুজরাতের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুললেন। বারদৌলির কৃষক আন্দোলনের রূপকার বল্লভভাই 'সর্দার' অভিধায় ভূষিত হলেন। সর্দার প্যাটেলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। প্রথমে আন্দোলনের রাজনীতি ও পরে ক্ষমতার রাজনীতি পরিচালনার জন্য এই রকম মজবুত সংগঠনের প্রয়োজন পড়ে। গান্ধীজী ও প্যাটেল ব্যতীত গুজরাতে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা যোগ্যতার পরিচয় দেন। এদের মধ্যে ভুলাভাই দেশাই, কে এম মুন্সি, মোরারজি দেশাই, জি ভি মবলঙ্কর এবং ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত গুজরাত রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী জীবরাজ মেহতার নাম উল্লেখযোগ্য।

গুজরাত কংগ্রেস রাজনীতির দুর্ভেদ্য দুর্গ নামে পরিচিত হয় এবং সঙ্গত কারণেই গুজরাতকে জাতীয় সংগ্রামের স্তালিনগ্রাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিগত শতকের সত্তরের দশকে গুজরাত কংগ্রেসের পায়ের কাঁটায় পরিণত হয়। উপদলীয় সংঘাত, দুর্নীতি আর জাতপাতের রাজনীতির ফলে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি মলিন হয়ে ওঠে। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস ও ভারতীয় রাজনীতির উপর প্রভুত্ববাদী শাসন কায়েম করেন। প্রতিটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের তিনি মনোনীত করতেন। এদিকে সারা ভারতব্যাপী জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের ডাক দিলেন। ১৯৭৪ সালে গুজরাতে নবনির্মাণ সমিতি ও ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি স্বৈরতন্ত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়। সেই সময় নরেন্দ্রভাই মোদি ছিলেন ছাত্র। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, দেশব্যাপী আন্দোলনে জনসঙ্ঘ (বর্তমানে বিজেপি) দলের কর্মীরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের প্রথমে গুজরাতের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়। তার মধ্যেই ছিল গণতন্ত্রের সপক্ষে সর্বভারতীয় গণআন্দোলনের সংকেত।

তারপর আশির দশক থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বাইরে থেকে সন্ত্রাসবাদের আঘাত আর ভেতরে জাতপাত ও ধর্মকে উসকানি দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিকে শিথিল করার অপচেষ্টা শুরু হলো। দিল্লীতে শিখ নিধনযজ্ঞ সম্পন্ন করে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হলো। রাজীব গান্ধী ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জাতপাতের রাজনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিজেপি হিন্দুত্বের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জমায়েত নীতি গ্রহণ করল। দুর্নীতিসম্পন্ন ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের কোণঠাসা করে দেশপ্রেম ও আর্থ-সামাজিক বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়ে মোদী যে পথ দেখালেন, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারত ও ভারতবাসীর সার্বিক বিকাশের মন্ত্র।

নেত্রদান মহাদান

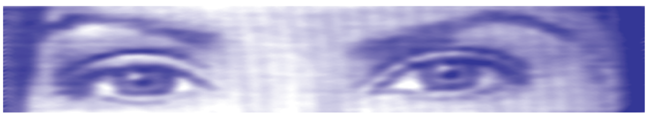

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

না, না, না, তৃণমূল আর বরযাত্রী যাবে না

শ্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নমস্কার স্যার।

মানুষের মুখে মুখে খাবার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে আপনি। অন্তত আপনার দফতরের নামটা শুনলে সেটাই মনে হয়। কিন্তু আমি যার কথা লিখছি তার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো পাবলিকের ক্ষেত্রে অবশ্য বাবাই খাদ্য মন্ত্রক সামলান। বাবার হোটেলে রেগুলার খেলেও মাঝে মধ্যে যে অন্য হোটেলে সে খায় না তা অবশ্য নয়। এই যেমন পাড়ায় কারও বাড়িতে মোচ্ছব হলেই তেনার উপস্থিতির গ্যারান্টি আছে। ওর মতো খাদ্য লোভিদের জন্য বিয়ে বাড়ি থেকে শ্রাদ্ধ বাড়ি সব এক। সবাই জানে ওরা দল বেঁধে আসবেই। তাই আগে ভাগেই ক্লাবে এসে বলে দেয়। তোরা যাস কিন্তু সব।

কিন্তু ইদানীং একটা সমস্যা হয়েছে। সেকারণেই আপনাকে এই চিঠি লেখা। সে এক দারুণ বেদানাদায়ক গল্প। আমাকে দল বেঁধে ওরা বলে গেছে। আপনাকে একটু সময় করে শুনতেই হবে। গোড়া থেকেই বলি।

এটা গোটা রাজ্যের সমস্যা মোটেই নয়। একটা পাড়ার সমস্যা। পাড়ার ঠিকানা হলো, ঝিলিক নগর, থানা হাবড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। নামে ঝিলিক নগর হলেও এটা একেবারেই মাঝারি মাপের একটা পাড়া। খুব একটা নাম শোনেনি কেউ কারণ, এখানে সবাই বেশ ভাবভাব। এ পাড়ার কেউ নানুর, লোবা কিছুই ঘটাতে পারে না। তাই খবরের কাগজে নামও ওঠে না। খ্যাতিও রটে না। এ পাড়ার যত খ্যাতি খাওনদাওনের ব্যাপারে।

যাই হোক, গত ২০১১ সালে এই গ্রামেও পরিবর্তন হয়েছে। সিপিএমের খাওয়া দাওয়ার মেনুতে তেমন টান না দেখেই ঘাসফুলের দিকে ঝোঁক বেড়ে যায়। ভোট টিফিনে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি-চিকেন দেখে কেউ আর লোভ সামলাতে পারেনি। সবাই পরিবর্তন করে নিয়েছে। নেমকহারাম নয় ঝিলিক নগরের ছেলেরা। 'যার টিফিন তার ভোট' থিওরি মেনে সবাই তৃণমূল হয়ে গেছে। না সবাই নয়, প্রত্যেক পাড়াতেই যেমন একটা না একটা গাড়ল পরিবার থাকে তেমন ঝিলিক নগরেও আছে। সেই বাড়ির ছেলে ভোম্বলের বিয়ে আগামী ২৩ মাঘ। ৬ ফেব্রুয়ারি। বুধবার। পাত্রী হুগলি জেলার নবগ্রামের শ্রীপতি নস্করের একমাত্র মেয়ে সুনয়না।

খাদ্যমন্ত্রী স্যার, আপনি ভাবছেন কোথাকার কে ভোম্বলের বিয়ে তো আপনার কী? কিন্তু ঝিলিক নগরের কাছে এই বিয়ে অনেক কিছু। কারণ, এই বিয়ের জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করে আছে সেখানকার ছেলে—বুড়ো সবাই। সেই বাম আমল থেকে এই ঘাসফুলের জমানায় কত মেয়েই তো দেখা হয়েছে ভোম্বলের জন্য। পছন্দও হয়ে গেছে দু'পক্ষের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেস্তে গেছে। কারণ আর কেউ নন ভোম্বলের বাবা গণপতি। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন সিপিএমের কোন লোকাল কমিটি না কী কমিটির যেন মেম্বর গণপতি। তাঁর এক গোঁ, ছেলের বিয়েতে এক পয়সা নগদ চাই না, খাট, পালঙ্ক, গয়না, নমস্কারি কিচ্ছু চাই না। শুধু গোটা গ্রামের সব ছেলেরা বরযাত্রী যাবে। কিন্তু কেউ এতদিন রাজি হচ্ছিল না এবার হয়েছে।

সে কারণেই তো ভোম্বলের বিয়ে ঠিক হতেই গোটা গ্রাম নেচে উঠেছে। ডবল খ্যাটন। এক তো বরযাত্রী গিয়ে কনেপক্ষের মেনু। তার ওপর আবার গণপতির মোচ্ছব তো আছেই। ভিয়েন বসবে। সানাই বাজবে। আলোয় আলোয় সাজবে ঝিলিক নগর। তার ওপর মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা, পোলাওয়ের গন্ধে ম ম করবে গোটা গ্রাম। মিষ্টিই হবে সাত রকমের। ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত ডুবে যাবে।

কিন্তু সব ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছেন আপনি স্যার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, খাদ্যমন্ত্রী। নিদান দিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের কোনও নেতা কর্মী সমর্থক সিপিএম বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাবে না। আগেই বলেছি স্যার, ঝিলিক নগরের ছেলে বুড়োরা নেমকহারাম নয়। পাড়ার ক্লাব ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অনুদান পেয়েছে। এরপর কি আর আপনার নির্দেশ অমান্য করা যায়!

পাড়ায় এনিয়ে মিটিং হয়েছে। সেখানেও ঠিক হয়েছে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী তথা দলের নেতা যখন বলেছেন তখন কোনও ভাবেই ওই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যাবে না। তৃণমূল কোনওভাবেই বরযাত্রী যাবে না। আর বৌভাতের দিন যখন ঝিলিক নগরের বাতাস মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা, পোলাওয়ের গন্ধে ম ম করবে তখন ক্লাব ঘরে চিকেন-ভাতের পিকনিক হবে। চল্লিশ টাকা করে চাঁদা।

কিন্তু তাতে কি আর হয়? দুধ, ঘিয়ের স্বাদ কি ঘোলে মেটে?

মন্ত্রীমশাই, আপনি একবার যাবেন নাকি ঝিলিক নগরে? গিয়ে একটু দেখে আসবেন নাকি ওদের মনোকষ্ট। আপনি হয়তো দল বা দফতরের পয়সায় ক্লাব ঘরে আরও ভালো মেনুর ব্যবস্থা করে দিতেই পারেন। কিন্তু সেটা তো আর অনেক অপেক্ষার ভোম্বলের বিয়ে খাওয়া হবে না।

— **সুন্দর মৌলিক**

আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের সঙ্গে দায়িত্বের মেলবন্ধন ঘটেনি

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের আনা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করাই যায়নি সংখ্যাগত কারণে। এটা ঠিক যে, তার কিছুদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেস ইউপিএ থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার ফলে

কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় এই অবস্থাতে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারে না। বিরোধী দলগুলো একযোগে ভোট দিলে সরকার কিন্তু অচিরেই পড়ে যেত। কিন্তু তাদের অনৈক্যের ফলে এবারও সরকার টিকে গেল।

সকলেই জানেন যে, বৃটেনের অনুসরণে আমাদের সংবিধান ক্যাবিনেট-পদ্ধতি বা সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গণপরিষদে এই নিয়ে বিতর্কটা বেশ জমে উঠেছিল। জি এস গুপ্ত, অধ্যাপক কে টি শাহ্, কাজী করিমুদ্দীন প্রমুখ সদস্যরা চেয়েছিলেন মার্কিন ধাঁচের শাসনব্যবস্থা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট কিন্তু আইনসভার কাছে দায়ী থাকবে— সুতরাং আইনসভায় পরাজয় ঘটলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে হয়। তার ফলে এই ব্যবস্থায় দেখা দিতে পারে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা। কিন্তু মার্কিন ব্যবস্থায় মন্ত্রিত্বভার স্থায়িত্ব আইনসভার আস্থা-অনাস্থার ওপর নির্ভর করে না। রাজনৈতিক স্থায়িত্বের জন্যই তাঁরা এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

মেহবুব আলী, বেগ সাহেব বাহাদুর প্রমুখ সদস্যও স্থায়িত্ব চেয়েছিলেন। তবে তাঁরা চেয়েছিলেন সুইজারল্যান্ডের শাসনপদ্ধতি, কারণ সেটাও স্থায়িত্ব এনে দেয়। সুতরাং বলা চলে গণপরিষদে বেশ কয়েকজন বক্তাই বৃটিশ পদ্ধতি গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংবিধান এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে।

খসড়া কমিটির সভাপতি ডঃ বি আর আম্বেদকর জোরালো ভঙ্গীতে বৃটিশ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য সওয়াল করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল— ক্যাবিনেট পদ্ধতি যে স্থায়িত্বের সঙ্গে দায়িত্বের মেলবন্ধন ঘটায়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেখেছে বৃটেন। তাঁর মতে, বৃটেনে ক্যাবিনেটের দায়িত্বশীলতা রয়েছে— কিন্তু তাতে তার স্থায়িত্ব নষ্ট হয়নি। তাঁকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন আরেক সদস্য আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার। আর ডঃ কে এম মুন্সী দিয়েছিলেন অকাট্য এক যুক্তি— আমরা দু-শ বছর ধরে বৃটিশ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত— সুতরাং এটাই আমাদের দেশের সঙ্গে সহজে খাপ খেয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, তাঁদের যুক্তিই গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্যকে প্রভাবিত করেছিল। ডঃ পঞ্চানন মিশ্র এই কারণে মন্তব্য করেছেন, গণপরিষদে সামান্য বিতর্কের পরেই সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে (দ্য মেকিং অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিপাব্লিক)।

কিন্তু সংবিধান গ্রহণের ছয় দশক পরে এই প্রশ্নটা উঠতেই পারে— সংসদীয় ব্যবস্থা আশানুরূপ সফল হয়েছে কি? স্থায়িত্বের সঙ্গে দায়িত্বের সেই কল্পিত মেলবন্ধন কি আমাদের দেশে ঘটেছে?

আসলে, নেহরু-যুগে সারাদেশে কংগ্রেসের একাধিপত্য, নেহরু ও অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীদের ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি ব্যাপারগুলো সংসদীয় ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার দুর্বলতা। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছে, অথচ অ-কংগ্রেসী কোনও দলই একক গরিষ্ঠতা পায়নি। তার ফলে এইসব রাজ্যে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিকেশান- ক্যাবিনেট। অথচ পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের ঐক্যকে ব্যাহত করেছে— অবাধে চলেছে সরকার ভাঙা-গড়ার খেলা। প্রায় সারাদেশে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা। নিত্য-নতুন জোটের আবির্ভাব ও তাদের মধ্যে অবিশ্রান্ত ভাঙন সৃষ্টি করেছে অনিশ্চয়তার রাজনীতি। সেই কারণে বারবার এই সব রাজ্যে ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির ফলেই এসেছে স্থিতি।

কেন্দ্রে এই ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল কিছুটা দেরীতে— ১৯৭৯ সালে। ১৯৭৭ সালের লোকসভা-নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটায় ক্ষমতায় বসেছিল জনতা দল। এটা ছিল চারটে রাজনৈতিক দলের সাময়িক ঐক্যের ফসল। দু'বছরের মধ্যেই তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ায়

> **১৯৮১ সালে কংগ্রেসের সাফল্য আবার স্থায়িত্ব এনে দেয়— ইন্দিরা গান্ধী স্বচ্ছন্দে মেয়াদ পূর্ণ করেন। ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধীও বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেন। তাৎপর্যের বিষয় হলো— এটাই সাম্প্রতিককালে একদলীয় সরকার গঠনে শেষ নিদর্শন— বারবার তাই সংখ্যালঘু সরকার অথবা কোয়ালিশন-ক্যাবিনেট গঠন করতে হয়েছে।**

এই সরকার ১৯৭৯ সালেই ভেঙে পড়ে। দলছুট-নেতা চরণ সিং নতুন এক সরকার গড়লেও ২৪ দিনের মাথায় তিনি গরিষ্ঠতার অভাবে পদত্যাগে বাধ্য হন।

১৯৮১ সালে কংগ্রেসের সাফল্য আবার স্থায়িত্ব এনে দেয়— ইন্দিরা গান্ধী স্বচ্ছন্দে মেয়াদ পূর্ণ করেন। ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধীও বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেন। তাৎপর্যের বিষয় হলো--- এটাই সাম্প্রতিককালে একদলীয় সরকার গঠনে শেষ নিদর্শন— বারবার তাই সংখ্যালঘু সরকার অথবা কোয়ালিশন-ক্যাবিনেট গঠন করতে হয়েছে। এরপর ভি পি সিং (১৯৮৯), চন্দ্রশেখর (১৯৯০), নরসীমা রাও (১৯৯১), অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯), দেবগৌড়া (১৯৯৬), গুজরাল (১৯৯৭) এবং মনমোহন সিং (দু'বার) ক্যাবিনেট গঠন করেছেন। কিন্তু নরসিমা-ক্যাবিনেট, বাজপেয়ীর তৃতীয় ক্যাবিনেট এবং মনমোহনের একটা ক্যাবিনেট পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করতে পেরেছে। দেশাই ক্ষমতায় ছিলেন দু-বছর, চরণ সিং ২৪ দিন, দেবগৌড়া দশ মাস, গুজরাল প্রায় এক বছর, বাজপেয়ী প্রথমবার মাত্র ১৩ দিন এবং দ্বিতীয়বার বছর দুয়েক ক্ষমতায় ছিলেন।

হিসেবে দেখা যাচ্ছে— ১৯৭৭ থেকে আজ পর্যন্ত এই ৩৫ বছরে ১৪টা সরকার ক্ষমতায় এসেছে— তার মধ্যে ৮টা ভেঙে পড়েছে মেয়াদ শেষের আগেই। নরসীমা রাওয়ের গরিষ্ঠতা ছিল না, কোনওক্রমে তিনি অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। আর মনমোহনের সরকার আগে টিকে গেছে নানা ধরনের সমঝোতার ফলে।

এইসব কারণে বলা যায়— সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবিধান- রচয়িতাদের উচ্চ ধারণাটা বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। বহুবার দায়িত্বশীলতার সঙ্গে স্থায়িত্বের মেলবন্ধন হয়নি তেমন করে।

কারণগুলো কিন্তু অনেক।

প্রথমত, বৃটেনে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা থাকায় সংসদীয় ব্যবস্থা সফল হয়েছে। সেই দেশে একটা দল সরকার গঠন করে, অন্যটা বসে বিরোধী আসনে। তার ফলে সমালোচনা নিন্দার দ্বারা বিরোধীরা সরকারকে চাপের মুখে রাখে, কিন্তু সরকারের একক-গরিষ্ঠতা থাকায় তার পতন ঘটে না।

দ্বিতীয়ত, সেখানে দল-ব্যবস্থায় রয়েছে যথেষ্ট শৃঙ্খলা— তার ফলে সরকারের পক্ষে স্থায়িত্ব নিয়ে দুর্ভাবনা থাকে না।

তৃতীয়ত, সেই দেশে সাধারণত বহু দলের কোয়ালিশনের দরকার হয় না— দুটো দলের মধ্যে একটা গরিষ্ঠতা পায় এবং স্থায়ী সরকার গঠন করে।

চতুর্থত, বৃটেনে সদস্যরা সাধারণত দল বদল করেন না, সেই কারণেও ঘনঘন সরকারের উত্থান-পতন ঘটে না।

কিন্তু আমাদের দেশে এই অনুকূল অবস্থা গড়ে ওঠেনি।

দ্বি-দল ব্যবস্থার বদলে এই দেশে দেখা দিয়েছে বহু-দলীয় বিশৃঙ্খলা। নানা ধরনের ৫০০-রও বেশি রাজনৈতিক দল ভারতে এখন সক্রিয়। তার ফলে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কদাচিৎ একটা দল একক-গরিষ্ঠতা পায়। এই কারণে বারবার কোয়ালিশন-ক্যাবিনেট তৈরি করতে হয়। তাদের মধ্যে বিরোধ বাধলেই সরকারের পতন ঘটে। বিশেষ করে, কোয়ালিশন হওয়ার কথা সমভাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যেই। কিন্তু ক্ষমতায় বসার লোভে ভিন্নধর্মী--- এমন কি, শত্রুভাবাপন্ন দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। তার ফলে অচিরেই সরকার ভেঙে পড়ে।

তাছাড়া, দলীয় আনুগত্যের দিকটাও এই দেশে এখনও শিথিল। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লোভে বা ক্ষোভে কিছু নেতা দল ভাঙেন এবং তার ফলেও সরকারের পতন ঘটে।

সবচেয়ে বড় কথা--- রাজ্যস্তরে আয়ারাম-গয়ারামদের কীর্তির ফলে বহুবার বহু রাজ্যে সরকারের পতন ঘটেছে। হিসেবে দেখেছি— ১৯৬৭-র মার্চ থেকে ১৯৭৯-র এপ্রিল পর্যন্ত ৫৩০ জন বিধায়ক দল বদল করেছেন— তবে অনেকে এটা একাধিকবার করায় সংখ্যাটা (দল-বদলের) দাঁড়িয়েছিল ১০০০। হরিয়ানার ৭৯ জনের মধ্যে ৪০ জনই দল বদল করেছিলেন— কেউ কেউ ৩/৪ বারও আনুগত্য পাল্টে ছিলেন ব্যক্তিগত লোভে। তার ফলে ঘনঘন সরকারের পতন ঘটেছে। এই ভাবে দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা— বারবার পতন ঘটেছে কোয়ালিশন সরকারের। এইসব কারণে বলা যায়— আমাদের দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা তেমন সফল হয়নি। দায়িত্বশীলতা অনেক ক্ষেত্রেই স্থায়িত্ব নষ্ট করেছে। বহুবার সরকার অসময়ে ভেঙে পড়েছে, কখনও আবার সমর্থনকারী দল সরে যাওয়ায় সরকারের টালমাটাল অবস্থা হয়েছে। এটা মোটেই সংসদীয় ব্যবস্থায় কাম্য নয়।

গুজরাট আজ যা ভাবে....

দীনেশচন্দ্র সিংহ

জয়বাবা সোমনাথ—গুজরাটের আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব মহাদেব। তুমি শেষ খেলা খেলিয়ে ছাড়লে। যত কুৎসা অপবাদ চক্রান্ত ষড়যন্ত্র পদাঘাতে চূর্ণ করে নর+ইন্দ্র= নরেন্দ্রকেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন রাখলে। নরেন্দ্র মোদিকে সরাবার যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ফাঁদা হয়েছিল, সপ্তরথী মিলে একা অভিমন্যুকে খতম করার মতো যে জাল বিস্তার করা হয়েছিল, সব ফাঁদ সব জাল ছিন্ন ভিন্ন করে একা কুম্ভ তার আসল গড় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর গুজরাট গড়কে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পেরেছেন।

দেশের কোনও একটি অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এমন কৌতূহলের সৃষ্টি ইতিপূর্বে আর হয়েছে কিনা জানা নেই। নরেন্দ্র-বধ করতে পারলে বিজেপিকে খোঁড়া করা যাবে এবং ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ডুবন্ত তরী ভেসে উঠে রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসাবার পথ খোলসা হবে এবং ভারতে প্রথম খৃস্টান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হবে বলে যারা আশায় আশায় বুক বেঁধেছিল— তাদের সে আশার তরী আরব সাগরে তলিয়ে গেল বলা যায়। বৈষ্ণব কবির ভাষায় ''সকলি গরল ভেল'।

চেষ্টার কসুর তো কম হয়নি। বিভিন্ন খাতের সরকারি অর্থ বেহাত করে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে ব্যয় করা হয়েছিল। কংগ্রেসের রাজমাতা সোনিয়া গান্ধী গুজরাটি মহিলাদের ঢং-এ শাড়ী পরে গুজরাটি 'গরবা' নাচ নাচলেন, বুড়ো

শাসনকর্তাদের এই দ্বিচারিতায় বিক্ষুব্ধ খাঁটি গুজরাটী হিন্দুরা অহিংস উপায়ে প্রতিবাদ জানালেন ব্যালট বক্সের মাধ্যমে। সেখানে কারও কোনও জারিজুরি খাটল না। দেশ-নেতা কেমন হওয়া উচিত সেটা দেখিয়ে দিল গুজরাটবাসী হিন্দুরা। এখন থেকে গুজরাটের পথই ভারতের বাঁচার পথ।

মনমোহন সিং মানমর্যাদা ভুলে চাকরি বাঁচাতে রাহুল বাবার জন্য ভোট-ভিক্ষা করতে পাঞ্জাবী 'ভাংরা' নাচ নাচলেন, প্রধানমন্ত্রীর গদির ভাবী হকদার রাহুলজী তার চামচাবাহিনী নিয়ে সারা গুজরাটে চ্যাংড়া নাচ নাচলেন এবং গুজরাটে গান্ধীর রাজনীতির ধারকবাহক হিসেবে জালিয়াতি 'সারনেমের' জোরেই যে বংশানুক্রমিক ভারত শাসনের অধিকারী, তা আকারে ইঙ্গিতে প্রচার করতেও লজ্জা বোধ করেননি। কিন্তু কিছুতেই হালে পানি পেলেন না। চালাকির দ্বারা অসৎ কাজ সিদ্ধ হলো না--- প্রাকৃতিক নিয়মেই কংগ্রেস আরব সাগরে নিমজ্জিত হলো। আর প্রাকৃতিক নিয়মের তোয়াক্কা না করেই যেন পশ্চিমে আরব সাগরের বুক চিরে কমল লাঞ্ছিত হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা প্রভাত-সূর্যের মতো উদয় হলো।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন যে, ৭১২ খৃস্টাব্দে বর্বর মুসলিম লুঠেরার দল সিন্ধু জয় করে ক্রমে গুজরাট, পাঞ্জাব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সিন্ধুকে সম্পূর্ণভাবে এবং পাঞ্জাবের অর্ধাংশ ইসলামীকরণ করতে পারলেও, গুজরাটে হিন্দুত্বের অবসান ঘটাতে পারেনি। পরে ৭০০ বছর দিল্লীতে ক্ষমতাসীন থেকেও পাঠান-মোগল বারে বারে অভিযান চালিয়েও গুজরাটে ইসলামী চাঁদ তারা মার্কা নিশান স্থায়ীভাবে উড্ডীন রাখতে পারেনি। বিষাণ বাজিয়ে তার উপর গৈরিক পতাকা পতপত করে উড়েছে। তার প্রমাণ ১৭ বার সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার পরও সেই ধ্বংসস্তূপের উপর বাবা সোমনাথের মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

নরের মাঝে ইন্দ্রতুল্য নরেন্দ্রকে বিনাশ করতে অসুরবাহিনী তো চেষ্টার ত্রুটি

করেনি। অঘাসুর বকাসুর ডাকিনী যোগিনী তাড়কার দল তো ছিলই, সঙ্গে ঘরের শত্রু বিভীষণের দলও কোমর বেঁধে পেছনে লেগেছিল। শ্মশানযাত্রী কেশুভাই পেটেল, বহিষ্কৃত শঙ্কর সিং ছাগেলা, শাস্তিপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের বৌকেও লড়াই-এর ময়দানে হাজির করেছিল কংগ্রেস। যান্ত্রিক অযান্ত্রিক সকল প্রকার প্রচারযন্ত্রকেও হাত করেছিল কংগ্রেস অজস্র অর্থব্যয়ে। সর্বোপরি হাতে রয়েছে সিবিআই, আই বি, সি আই ডি, সীট, ই সি, হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্ট। এরা গোধরা স্টেশনে রামসেবকদের ট্রেনের কামরায় পুড়িয়ে মারায় তেমন বিচলিত বোধ করেন না, কারণ তারা হিন্দু সন্তান বলে।

কিন্তু তারই প্রতিক্রিয়ায় গুজরাটে হিন্দুরা যে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাল, তার জন্য সবাই মিলে কেঁদে বুক ভাসাল— কারণ তারা মহম্মদের বাচ্চা বলে। শাসনকর্তাদের এই দ্বিচারিতায় বিক্ষুব্ধ খাঁটি গুজরাটী হিন্দুরা অহিংস উপায়ে প্রতিবাদ জানালেন ব্যালট বক্সের মাধ্যমে। সেখানে কারও কোনও জারিজুরি খাটল না। দেশ-নেতা কেমন হওয়া উচিত সেটা দেখিয়ে দিল গুজরাটবাসী হিন্দুরা।

এখন থেকে গুজরাটের পথই ভারতের বাঁচার পথ। সেকুলারিজম নামক ভূত জাতির ঘাড় থেকে নামাবার চরমক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। আমরা সমস্বরে বলতে পারি : “জয়বাবা সোমনাথ” তৎসহ “ততো জয় মোদীরয়েৎ”। অর্থাৎ মোদীরই জয়জয়কার।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : গুজরাট আজ যা ভাবল, সারা ভারত ২০১৪ সালে তা ভাববে তো? বাপস্! জয় বলে জয়! একেবারে অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টিকারী Poll-Vault!

SATYA NARAYAN ACADEMY
C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.
CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765
ADVT.

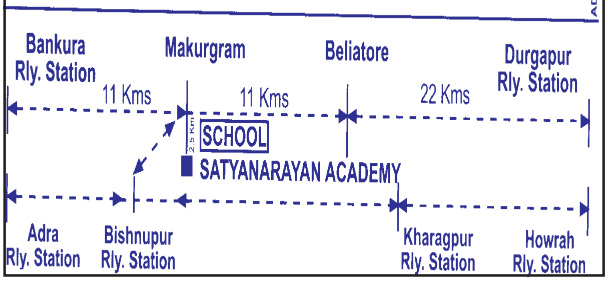

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

গুজরাটে আবার নরেন্দ্র দামোদর মোদী তথা ভারতীয় জনতা পার্টি

অমলেশ মিশ্র

আজ ২০ ডিসেম্বর গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলো। ১৮২ আসন বিশিষ্ট এই বিধানসভায় বিজেপি পরপর তিনবার জয়ী হল। ২০০২, ২০০৭ এবং ২০১২। তবে ২০০৭-এর নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল ১১৭টি আসনে, এবার ১১৫টি আসনে। ভোট পেয়েছে--- বিজেপি-৪১ শতাংশ, কংগ্রেস- ৩৮ শতাংশ। ১৮২ আসন বিশিষ্ট গুজরাট বিধানসভায় বিজেপি- ১১৫, কংগ্রেস- ৬১, কেশুভাই প্যাটেলের জিপিপি-২, অন্যান্য-৪।

প্রাক্তন বিজেপি নেতা কেশুভাই প্যাটেল একটি নতুন দল তৈরি করলেন গুজরাট পরিবর্তন পার্টি নামে। গুজরাটের প্যাটেলদের ভোট মোদীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজেপি-কে পরাজিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গুজরাটে প্যাটেল ভোট মোট ভোটের একটি বৃহৎ অংশ ১৮ শতাংশ। এছাড়াও প্রাক্তন বিজেপি নেতা শংকর সিং বাঘেলা ছিলেন গুজরাট বিজেপির উল্লেখযোগ্য বিরোধী। সেক্সপীয়ার বলেছিলেন— Near the blood, nearer bloody। বাংলায় বলে গাঁটের ছুরি পেট কাটে। আত্মীয় যখন শত্রু হয়, বিরুদ্ধতা মারাত্মক হয়। এছাড়াও বিরোধে ছিল কংগ্রেস। কিন্তু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সব থেকে বড় বিরোধিতা করেছে প্রকৃতি— তার অতি কৃপণ বৃষ্টিপাতে।

গুজরাট রাজ্যটির ব্যাপার-স্যাপার পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারীদের পক্ষে চট্ করে উপলব্ধিতে আনা যাবে না। ভারতীয় জনতাপার্টির (বিজেপি) দর্শনের আংশিক রূপায়ণ করতে পারলেও যে সেটা কী স্তরে যেতে পারে গত ১১ বছর গুজরাট সরকার চালিয়ে বিজেপি সেটা প্রমাণ করেছে। ভারত সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও পাঁচ বছর (১৯৯৯-২০০৪) সময়ে বিজেপি সেই প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। গুজরাটে বিজেপি দর্শনকে রূপায়িত করার কারিগর নরেন্দ্র মোদী আর ভারতের ক্ষেত্রে সে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

> গুজরাটে বিজেপি সরকার প্রতিহিংসার মাধ্যমে বিরোধীদের মোকাবেলা করে না যেমনটি এই রাজ্যে আমরা দেখতে অভ্যস্ত। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১০ বছরে বিজেপি সরকার গুজরাটকে এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে বিরোধীদল কংগ্রেস অনেক লাফিয়েও সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি।

গুজরাট সরকার গত ১১ বছর পরিচালিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী দর্শনের ভিত্তিতে। এই অগ্রগতির মূলে আছে সেই জাতীয়তাবাদ-এর বোধ।

অন্যান্য দল এবং সংবাদমাধ্যমগুলি নরেন্দ্র মোদী এবং অটল বিহারীর নাম যতটা করেন, বিজেপির নাম ততটা করেন না। বিজেপি নামে তাঁদের এলার্জি আছে। মূল কর্তৃত্বটা আছে নরেন্দ্র মোদীর হাতেই। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত হলেন একটা দর্শন ও আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। হাততালি কুড়ানো বহু নেতা-নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী আছেন এদেশে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী একজনই। বহু রাজনৈতিক দল আছে এদেশে, কিন্তু জাতীয়তাবাদ বোধে উদ্বুদ্ধ দল একটিই এবং সেটি হলো বিজেপি।

সাংবাদিকরা আলোকবৃত্তে আনেন নরেন্দ্র মোদীকে। সেটাই তাঁদের পক্ষে নিরাপদ। বিজেপিকে আলোকবৃত্তে আনার অনেক বিপদ আছে। বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে তার নিন্দাবাদ যতটা করা হয়, অটলবিহারী বা নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য দেখিয়ে বিজেপিকে মহৎ করে দেখানো হয় না। ১১ বছরে এই তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িক' দলটি গুজরাটে যা করেছে বলতে ইচ্ছা হয় সারা ভারতেও যদি এই তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িক' দলটি সরকার চালাতে পারত ১০ বছর বা ১৫ বছর তাহলে এই দেশটি এবং এর মানুষগুলি গাড্ডায় পড়তো না।

ভাবা যায় যে একদশকে একটি রাজ্যের মাথাপিছু আয় চারগুণ বাড়তে পারে! গুজরাটেই তা ঘটেছে। ২০০১ সালে মাথা পিছু আয় ছিল ১৯,৮২৩ আর ২০১১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭৫,১১৫ টাকায়। এটাও কি ভাবা যায় যে ১৯৬০ থেকে ২০০২ পযন্ত ৪২ বছরে যে রাজ্যে পরিকল্পিত উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত হয়েছে ৫৫,৫৩৪ কোটি টাকা, সেই রাজ্যেই গত দশ বছরে পরিকল্পিত উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত হয়েছে ১৭৮ লক্ষ কোটি টাকা।

গুজরাটের নির্বাচনী ইস্তাহারে (২০১২) নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন যে আগামী

৫ বছরে পরিকল্পিত উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হবে ৩ লক্ষ কোটি টাকা। গুজরাটের প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে এখন আলোচিত। দশ বছরের শাসন কালে ২৫০টি পুরস্কার জুটেছে গুজরাটের অর্থাৎ প্রায় ১৫ দিন অন্তর একটি করে। ১০ বছরে কৃষি, শিল্প এবং পরিষেবা তিনটি ক্ষেত্রেই সমানুপাতিক হারে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি। গুজরাটে রাজস্ব ঘাটতি নেই— রাজস্ব উদ্বৃত্ত রাজ্য।

শিল্পায়ণ প্রসঙ্গে সারা ভারতবর্ষে গুজরাটের নাম সবার আগেই আসে। গুজরাটকে বলা হয় 'অটো হাব' (Auto Hub)। পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাটা কোম্পানীর 'ন্যানো' কারখানা যখন তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিমৃষ্যকারিতা ও আহাম্মকিতে এবং তদানীন্তন রাজ্য সরকারের কাপুরুষতায়, গুজরাটে চলে গেল— তখন থেকেই অর্থাৎ ২০০৮ থেকেই 'অটোহাব' হিসাবে গুজরাটের জয়যাত্রা শুরু। এখন বিশ্বের নানা কোম্পানী তাদের গভীর উৎপাদন ক্ষেত্র হিসাবে গুজরাটকে বেছে নিচ্ছে।

গুজরাটে বিজেপি সরকার প্রতিহিংসার মাধ্যমে বিরোধীদের মোকাবিলা করে না যেমনটি এই রাজ্যে আমরা দেখতে অভ্যস্ত। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১০ বছরে বিজেপি সরকার গুজরাটকে এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে বিরোধীদল কংগ্রেস অনেক লাফিয়েও সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি। তার ফলে এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস রাজনৈতিক বিরোধিতা যেমন করতে পারেনি, সাম্প্রদায়িকতার পচাবুলিও আওড়াতে পারেনি।

কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধী অক্টোবর মাসে রাজকোটে জনসভা করে যে দিকটি নির্দেশ করে গুজরাটের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেছিলেন সেটি ছিল এই সরকারের দুর্বলতম দিক। সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন যে গুজরাটের বিজেপি সরকার ব্যর্থ কারণ নর্মদা নদীর জল এখনও সৌরাষ্ট্র এলাকায় পৌঁছে দিতে পারেনি।

সোনিয়া গান্ধী ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছিলেন। সরদার সরোবর প্রকল্পের একটি অঙ্গ ছিল সৌরাষ্ট্র এলাকায় নর্মদার জল পৌঁছে দেওয়া। গত ১০ বছরে সে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।

তবে কংগ্রেসের থেকেও এবছর অর্থাৎ এই নির্বাচনী বছরে গুজরাট সরকারের সব থেকে বড় শত্রু ছিল প্রকৃতি। এ বছর গুজরাটে বৃষ্টিপাত ছিল স্মরণকালের মধ্যে সব থেকে কম। গুজরাটে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের মাত্র ২০ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে। সৌরাষ্ট্র কচ্ছ এবং উত্তর গুজরাটে এমনিতেই জলাভাব। সরদার সরোবর প্রকল্পের জল পৌঁছায়নি। ফলে চরম দুর্দশায় পড়েছে এই এলাকা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই এলাকাতেই বিজেপির দলগত প্রভাব বেশি। এই এলাকার মানুষরা আশা করেছিলেন যে বিজেপি সরকার আসার পর তাদের ওই দুরবস্থা ঘুচবে। সর্দার সরোবর প্রকল্প ওই এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তাদের আশাপূরণ হয়নি।

বৃষ্টিপাত অস্বাভাবিকভাবে এবছর কম হওয়ায় খরিফ ফসল দারুণ মার খেয়েছে। তুলা এবং চিনাবাদামের চাষও মার খেয়েছে। গুজরাটে ১১ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন যা বিজেপি সরকারের কাছে এক কলঙ্ক। রাজ্য সরকার ১ লক্ষ টাকা করে পরিবার প্রতি ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তা ক্ষতির তুলনায় নগণ্য। জলাভাবের কারণে চলতি বছর তুলা এবং বাদামের চাষও হয়েছে কম। গুজরাট বিধানসভার ১৮২ আসনের মধ্যে ৫৮টি আসনই এই এলাকায়। ফলে এই কম বৃষ্টিপাত বিজেপির নির্বাচনী সাফল্যে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক ছিল। ২০০২ এবং ২০০৭-এর নির্বাচনে বিজেপি এবং তার গুজরাট নেতা মোদির পক্ষে যে অসুবিধা ছিল তা মূলত ছিল কংগ্রেসের দিক থেকে। কিন্তু এবার প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণে। কংগ্রেসের মূল প্রচার ছিল সাম্প্রদায়িকতার। এবারের নির্বাচনে সেই প্রচার কাজে আসেনি।

সাম্প্রদায়িকতার প্রচারটি ধোপে টেকেনি কারণ বিজেপির নীতি অনুযায়ী নরেন্দ্র মোদী প্রচার করেছেন যে— সকলকে ন্যায়, তোষণ কাউকে নয় (Justice to all, appeasement to none)। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি যে আসলে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি এ বিষয়টা বারবার বলা হয়েছে। এখন মানুষ কোনও দল ও সরকারকে বিচার করছে উন্নয়নের নিরিখে। এই দিকটা মোদী খুব ভালই বুঝেছিলেন। তাই গুজরাট সারা ভারতবর্ষে উন্নয়নের মডেল।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মোদী প্রদর্শিত পথই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দিক নির্দেশক। রাজ্যগুলিকে আর্থিক ভাগ দেওয়ার কেন্দ্রীয় নীতির পরিবর্তন দাবী করে যে নীতি প্রবর্তনের কথা মোদী বলেছেন তাও সর্বদল গ্রাহ্য হওয়া উচিত। মোদীর সাফ কথা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলি কেন্দ্রের অনুগ্রহ ভিক্ষু নয়। উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে ন্যায়সংগত অর্থ পাওয়া রাজ্যের অধিকার। রাজ্যগুলি দাবী করে যে আদায়কৃত করের ৫০ শতাংশ তাদের পাওয়া উচিত। কিন্তু তারা পায় মাত্র ৩২ শতাংশ।

মোদীর পরিষ্কার কথা হলো— ভারত গঠনের জন্য একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ২৮ জন শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী, শত শত শক্তিশালী মেয়র এবং হাজার হাজার শক্তিশালী পঞ্চায়েত প্রধান। অর্থ, পদমর্যাদা, স্বজন-পোষণ যাদের নীতি, দেশ শাসনে তাদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পক্ষ থেকে গুজরাটে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে তা এক বিরাট স্বপ্ন দেশের মানুষের সামনে এনে দিয়েছে। সামনের পাঁচবছর বলবে সেই স্বপ্নগুলি নরেন্দ্র মোদী কতটা বাস্তবায়িত করতে পারবেন। বিজেপি নেতা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী যে দর্শনে গুজরাট এবং সারা ভারতের কথা ভাবতে পারেন, অবিজেপি দলগুলির নেতারা সে উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেননি, তাঁদের কেউ কেউ মোদীর মতো তিনবার হয়তো মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু বিকাশ-এর মডেল হতে পারেনি।

মোদীর কৃতিত্ব যে তিনি গুজরাটকে বিকাশ বা উন্নয়নের মডেল হিসাবে শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন।

মোদীর গুজরাট জয় : পরিসংখ্যানের নিরিখে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী তোপ দেগেছিলেন 'মৃত্যুর সওদাগর' বলে। প্রকৃতপক্ষে মোদীর বিপক্ষে কংগ্রেসের একটাই অভিযোগ ছিল

পরিসংখ্যান - ১ : মুসলিম ভোটারদের আস্থা মোদীতেই

আসন	মুসলিম জন-সংখ্যা (শতাংশে)	জয়ী দল	ভোটের শতাংশ
ভেজালপুর	৩৫	বিজেপি	৫৯.০০
বাপুনগর	২৮	বিজেপি	৪৫.৬০
ভাগরা	৪৪	বিজেপি	৫১.৪৩
ভারুচ	৩৮	বিজেপি	৬০.১৯
জামালপুর-খাদিয়া	৬০	বিজেপি	৩৮.৮৮
জম্বুসার	৩১	বিজেপি	৫২.০১
লিম্বায়েত	২৭	বিজেপি	৫৩.২২
দরিয়াপুর	৪৬	কংগ্রেস	৪৯.৫৪
দানিলিমডা	৪৮	কংগ্রেস	৫৩.৭১

তিনি নাকি নির্বিচারে মুসলমান হত্যা করেছেন। কংগ্রেস আর তার সভানেত্রীর এহেন ঘৃণ্য প্রচারের জবাব দিলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং গুজরাটবাসী মুসলমানরাই। রাজ্যের ৯টি মুসলমান প্রধান এলাকা (যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ২৫ শতাংশের ওপরে)-র মধ্যে ৭টিতেই জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা।

পরিসংখ্যান - ২ : শিল্পমুখী মোদীকেই ভোট গুজরাটবাসীর

এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ এক গায়ক একদা একটা গানে গেয়েছিলেন, 'তুমি আসবে বলেই দেশটা এখনও গুজরাট হয়ে যায়নি'। গুজরাট আর তার মুখ্যমন্ত্রীকে অস্পৃশ্য করে রাখার ষড়যন্ত্র

জেলা	২০০৭*	২০১২*
আমেদাবাদ	১৩/২০	১৭/২১
রাজকোট	৭/১১	৬/১১
বরোদরা	৭/১৩	১০/১৩
সুরাট	৭/১২	১৪/১৬

* নির্বাচনের বছরে মোট আসনসংখ্যার নিরিখে বিজেপির প্রাপ্ত আসন।

এরাজ্যের বুদ্ধিজীবী আর সাংবাদিকদের নতুন কিছু নয়। কিন্তু ইদানীং এরাজ্য থেকে যখন একের পর এক শিল্প বিদায় নিচ্ছে, তখন গুজরাটে সূচিত হচ্ছে নতুন শিল্প-সম্ভাবনা। তার এমনই প্রভাব যে 'অস্পৃশ্য মোদী'র প্রশংসা না করে পারছেন না এরাজ্যের সাংবাদিককুলও। তবে এবারে নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে গুজরাটের মানুষ শিল্পমুখী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিই তাঁদের সমর্থন উজাড় করে দিয়েছেন। যে কারণে রাজ্যের শহরাঞ্চলে গতবারের (২০০৭) থেকেও বিপুল ভোটে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থীরা।

পরিসংখ্যান - ৩ : মুখ্যমন্ত্রীদের সাফল্যের নিরিখে

মুখ্যমন্ত্রী	রাজ্য	টার্ম	বছর
জ্যোতি বসু	পশ্চিমবঙ্গ	৫	১৯৭৭-২০০০
মোহনলাল সুখাডিয়া	রাজস্থান	৪	১৯৫৪-১৯৭১
তরুণ গগৈ	অসম	৩	২০০১-২০১২
কে কামরাজ	তামিলনাড়ু	৩	১৯৫৪-১৯৫৩
এম জি রামাচন্দ্রন	তামিলনাড়ু	৩	১৯৭৭-১৯৮৭
বিধানচন্দ্র রায়	পশ্চিমবঙ্গ	৩	১৯৪৮-১৯৬২
বসন্তরাও নায়েক	মহারাষ্ট্র	৩	১৯৫৩-১৯৭৫
গগন আপাং	অরুণাচল প্রদেশ	৪	১৯৮০-১৯৯৯
নবীন পট্টনায়ক	ওড়িশা	৩	২০০০-২০১২
ওকরাম আইবোবি সিং	মণিপুর	৩	২০০০-২০১২
শীলা দীক্ষিত	দিল্লী	৩	১৯৯৮-২০১২
নরেন্দ্র মোদী	গুজরাট	৩	২০০২-২০১২

ভারতবর্ষের দ্বাদশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে টানা তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জিতলেন নরেন্দ্রভাই মোদী। এখনও বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন যাঁরা এব্যাপারে মোদীর প্রতিযোগী যেমন নবীন পট্টনায়ক, ওকরাম আইবোবি সিং, শীলা দীক্ষিত, তরুণ গগৈ প্রমুখ। এই তালিকায় সবার ওপরের নামটি অবশ্যই জ্যোতি বসু। এখানে বিধানচন্দ্র রায়ের মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম যেমন আছে তেমনি জ্যোতি বসু ও তরুণ গগৈ-এর মতো বিতর্কিত মুখ্যমন্ত্রীদের নামও আছে যাঁদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে রিগিং করে এবং অনুপ্রবেশকারী মদতপুষ্ট ভোটে জেতার অভিযোগ রয়েছে।

বলাই বাহুল্য জয়ের হ্যাটট্রিক করে টানা চারবার মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকাভুক্ত হলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

চিঠিপত্র

গান্ধী পরিবারের অন্দর কথা

গত ২৬ নভেম্বর ২০১২-এর স্বস্তিকায় সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'উত্তরাধিকারহীন গান্ধী' এবং ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'মানুষ ফিরোজ গান্ধী' প্রবন্ধ দুটোর পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্রের অবতারণা।

স্বস্তিকার সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা বোধহয় অবগত আছেন যে আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীগোপালকৃষ্ণ গান্ধী-র মা-এর বাবার নাম চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এবং বাবার বাবার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সকলে এক বাক্যে তাঁকে গান্ধীজির নাতি বলেই জানেন, কেউ তাঁকে রাজাগোপালাচারীর নাতি বলে না। কিন্তু রাজীব গান্ধীকে সকলে নেহরুর নাতি বলে জানে, তাঁর ঠাকুরদাদার অর্থাৎ বাবার বাবার নাম গোপন করা হয় কেন? এবার আসল ঘটনাটা শুনুন। রাজীবের বাবার নাম মঃ ফিরোজ খান, ফিরোজ খানের আব্বা (বাবা) মঃ নবাব খান এক পার্শী মহিলাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নিক্‌খা (বিবাহ) করেন। তারই গর্ভজাত সন্তান ফিরোজ খান। ফিরোজের আব্বাজান এলাহাবাদের রেডলাইট এরিয়া মীরগঞ্জের এক মদ বিক্রেতা ছিলেন। ফিরোজ মতিলাল নেহরুর বাড়িতে যাতায়াতের সূত্রে ইন্দিরার প্রেমে পড়েন, ইন্দিরা ফিরোজকে বিবাহ করার জন্য কৃতসংকল্প হন, মা কমলা নেহরু তাতে প্রচণ্ড বাধা দেন, তখনও এদেশে অন্তর্ধর্মীয় বিবাহ আইন সিদ্ধ ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হয় ১৯৫৪ সালে। ফিরোজ ইন্দিরাকে নিয়ে লন্ডন চলে যান এবং এক মসজিদে তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেন। তাঁর মুসলমানী নাম রাখা হয় ফরজানা বেগম (Forjana Begam)।

এই ঘটনার পর নেহরু তাঁর গুরু গান্ধীজির শরণাপন্ন হন, গান্ধীজি তখন পরামর্শ দেন পাত্র পাত্রীকে খান-এর পরিবর্তে Ghandy (যা এক পার্শী পদবী) নাম বদল করে এক এফিডেফিট করে নিতে। কিন্তু ধূর্ত মদ বিক্রেতার ছেলে Ghandy-র পরিবর্তে (Gandhi) গান্ধী নামে এফিডেফিট করে নেন। এই ঘটনার কথা আমার জানা ছিল, ইংরেজী ১৯৫১ সালে জানুয়ারি মাসে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী) বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ডেলিগেট হিসাবে আমি যোগদান করি, এবং এলাহাবাদ থেকে আগত কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ফেরার পথে এলাহাবাদে দু' দিন অবস্থান করে স্থানীয় লোকদের সাহায্যে অনুসন্ধান করে আমি নিঃসন্দেহ হই যে ফিরোজ একজন খাঁটি মুসলমান। তাঁর ছুন্নত (পুরুষাঙ্গের ত্বকছেদ) অনুষ্ঠানে দাবাত (নিমন্ত্রণ) খেয়েছে এমন ৩/৪ জন বৃদ্ধ মুসলমানের সন্ধান পেলাম। যে ওস্তা (ত্বক ছেদকারী) তাঁকে ছুন্নত করিয়েছে তাঁর নাম মঃ এসাক। বাল্যকালে এলাহাবাদে যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন সেখানে ফিরোজ খান বলে উল্লেখ আছে। ফিরোজের আব্বাজানের এন্তেকালের (মৃত্যুর) পর তাঁকে এলাহাবাদে মুসলমান কবরখানায় কবর দেওয়া হয়। তিনি যদি পার্শী হতেন তবে তাঁকে পার্শী প্রথা অনুসারে টাওয়ার অব সাইলেন্স-এ শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হোত। ফিরোজের মৃত্যুর পর তাঁকে দাহ করা হয়। এলাহাবাদে আনন্দভবনে ফিরোজ ইন্দিরার বিবাহের যে অভিনয় করা হয় তা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

আমি কয়েকবারই আনন্দভবন পরিদর্শন করেছি। নেহরু অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ের বিবাহের ব্যাপার একদম চুপ কেন? এই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইন্দিরা যিনি জরুরি অবস্থার সময় অটল বিহারী বাজপেয়ীর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাকে জেলে পুরে ধুতি পাঞ্জাবী খুলে কয়েদিদের জন্য বরাদ্দ নীল ডোরাকাটা পাজামা এবং ফতুয়া পরতে বাধ্য করেছিলেন, গোয়ালিয়ারের রাজমাতা বিজয়া রাজে সিন্ধিয়াকে জেলে পুরে মাটিতে শুতে এবং লপসি খেতে বাধ্য করেছিলেন। জর্জ ফার্নান্ডেজকে পায়ে লোহার শিকল লাগিয়ে হাঁটিয়ে জেলে পুরেছিলেন। বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষের মতো সাংবাদিকদের জেলে পুরে রেখেছিলেন। সেই দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইন্দিরাকে পুরীর পাণ্ডারা মুসলমানী বলে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দিরে ঢুকতে দেননি, রাজীবকে মুসলমানের ছেলে বলে পাণ্ডারা নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরে ঢুকতে দেননি। এই নিয়ে মা ও ছেলে আর বেশি বাড়াবাড়ি করেননি, কারণ তাহলে ঝুড়ি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে। প্রত্যেক হিন্দুর একটা গোত্র থাকে। জিগ্যেস করবেন তো এঁদের কি গোত্র? আশা করি এবার পাঠক মহোদয়ের বুঝতে অসুবিধা হবে না কি করে খান পরিবার জাল গান্ধী পরিবার হয়ে গেল?

[তথ্যসূত্র : Impostors Galore and Rulling By Fooling— by A. Ghosh, Houston, Texas U.S.A. The Nehru Dynesty— by K.N. Rao, My Days with Nehru, Reminiscences of Nehru Age— by M.O. Methai.]

রাজীব গান্ধীর স্ত্রী সোনিয়া মাইনো একজন খৃস্টান ধর্মীয় মহিলা। সোনিয়াকে বিবাহ করার আগে রাজীবকে খৃস্টান হতে হয়। খৃস্টান হবার পর রাজীবের নাম হয় রাজীব রবার্টো গান্ধী। বিবাহের সময় গীর্জার খাতায় রাজীব রবার্টো গান্ধী নামে সই করেন, তাঁদের দুই সন্তান। প্রিয়াঙ্কা ভোদ্রা এবং বলুলভিঞ্চি খৃস্টান। রাহুল প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে রায়বেরিলীতে ৬-৫-২০০৬ তারিখে ঘোষণা করেছেন। তাহলে এদেশে কি প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য লোক নেই?

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

সংসদে অচলাবস্থা : ভারতীয় গণতন্ত্রের অশুভ লক্ষণ

রণজিৎ সিংহ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেশের সকল আইন-কানুন অনুমোদিত হয় পার্লামেন্ট বা সংসদের মাধ্যমে। এই সংসদ দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে নামাঙ্কিত। অনেক ক্ষেত্রেই এই সংসদ দুটি কক্ষে বিভক্ত। ইংলন্ডে উচ্চ কক্ষের নাম হাউস অফ লর্ডস, নিম্নকক্ষ হাউস অফ কমনস। আমাদের দেশে রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ), লোকসভা (নিম্নকক্ষ)। নাম যাই হোক না কেন সংসদের এই দুই কক্ষের কাজ জনগণের কল্যাণে যে কোনও বিল সুষ্ঠু, মার্জিত, তথ্যপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত করা। এই প্রসঙ্গ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রে যাঁরা এই দুই কক্ষে নির্বাচিত হবেন, তাঁদের দায়িত্ব এককথায় শেষ হয়ে যায় না! সদস্যদের প্রয়োজন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা চরিত্রবলে বলীয়ান হওয়া। এই সফল গুণের অভাব হলে সংসদীয় গণতন্ত্র কখনও উচ্চমানে পৌঁছাতে পারে না! আলোচনা হয়ে যাবে নীরস, তথ্যহীন, একপেশে। আইন তার যথার্থ রূপে পৌঁছাবে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এই নিম্নগামিতার দিকে দেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি রেখে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন আবশ্যক।

পরাধীনতামুক্ত হয়ে ভারতীয় সংসদের (উভয় কক্ষ) সদস্যদের মধ্যে দেখি জ্ঞান, বুদ্ধি, চরিত্রের অপূর্ব সমাবেশ। সরকার ও বিরোধী দুই পক্ষের সভ্যরা ছিলেন নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের উপযুক্ত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে-কোনও সরকারি বিল যথার্থ আইনে রূপায়িত হোত। মনে পড়ে যায় সেই সময়কার বরেণ্য বিরোধী সদস্যদের। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এন সি চ্যাটার্জি, আচার্য কৃপালনী, সুচেতা কৃপালনী, রামমনোহর লোহিয়া, হরিবিষ্ণু কামাথ, মধু লিমায়ে, এস. এন. ব্যানার্জী, ভূপেশ গুপ্ত, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী প্রমুখের, যাঁদের বাগ্‌নৈপুণ্য, সুনিপুণ তথ্য উত্থাপন সরকারি পক্ষকে মুগ্ধ করত এবং নির্দিষ্ট বিলের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে মন্ত্রী মহোদয় কোনও দ্বিধা করতেন না! একবার লোকসভায় ভারতে জনগণের দৈনিক রোজগার নিয়ে কথা উঠল। সেই সময়ের লোকসভার বরেণ্য সদস্য রামমনোহর লোহিয়া তথ্য দিয়ে জানালেন, অধিকাংশ দেশবাসীর আয় দিনে 'তিন আনা।' সরকারের তরফে অর্থমন্ত্রী জানালেন, এই রোজগার দিনে 'তিন আনা' নয়, 'পনেরো আনা'। সদস্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগল। শেষকালে সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হলো 'পনেরো আনা' নয়, 'তিন আনা'। ভারতের অধিকাংশ রোজগেরে মানুষের আয় এই 'দুই-এর' মাঝখানে'। লোহিয়াজীর উত্থাপিত প্রসঙ্গ সদস্যদের মনোজ্ঞ আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থিক পরিস্থিতির একটা করুণ চিত্র দেশবাসী জানতে পারল। ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বল্পকালীন পার্লামেন্টীয় জীবনে এক ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর বাগ্মিতা, বিচক্ষণতা, তথ্য উত্থাপনে অসামান্য পারদর্শিতা বিরোধীপক্ষকে যেমন উজ্জীবিত করেছে, সরকারি পক্ষকেও বারবার পরাস্ত করেছে। সরকার তাঁর যুক্তি মেনে নিয়ে বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছেন বিলকে আইনে পরিণত করতে। রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্ত ছিলেন বিরোধী পক্ষে 'একাই একশ'। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও বাচন ভঙ্গিমার কাছে সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে। আচার্য কৃপালনী এবং অধ্যাপক হীরেন মুখার্জীও তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ওজস্বিতায় লোকসভাকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। এই সদস্যরা ছাড়া যাঁদের নাম আগে উল্লেখ করেছি, তাঁরাও সংসদে ছিলেন নিজ নিজ মহিমায় ভাস্বর, অনুকরণীয় ও পূজ্য।

এবার এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, এই সদস্যদের পেছনে সেই সময় দলগত সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সরকারি পক্ষকে চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থা নয়। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সরকারি পক্ষ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই এইসব সদস্যকে সত্য কথনে বিরত করতে পারেনি। দেশ শাসনে সরকারের ত্রুটি তাঁরা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দেশবাসীর সাধুবাদ পেয়েছেন বিনিময়ে।

বর্তমানে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে স্বীকৃত জাতীয় বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। বিরোধী পক্ষের এই অবস্থা বিশেষ সুবিধেজনক। নির্ভয়ে বিরোধী সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য পার্লামেন্টে বিনা বাধায় রাখতে পারেন। কিন্তু গভীর বেদনা ও দুঃখের সঙ্গে আমরা কি দেখছি? সরকারের কোনও কথা ও উল্লেখিত ব্যবস্থা পছন্দমত না হলেই বিরোধীপক্ষরা ওয়েলে নেমে সেদিনের মতো পার্লামেন্টকে অচল করে দিচ্ছেন! এই অবস্থা দিনের পর দিন চলছে। সরকারি সংসদ কাজকর্ম আটকে যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। পার্লামেন্টেই সরকারের 'মন ও মুখ' জানার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু প্রতিদিন যদি পার্লামেন্ট অচল হয়ে যায়, সেখানে দেশবাসী সরকারের 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' কিছুই জানতে পারছে না! এই অবস্থা তো দীর্ঘদিন চলতে পারে না। সরকারি কোষাগার সংসদ চলাকালীন তার ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু সদস্যদের বিরূপ আচরণে পার্লামেন্ট আজ স্তব্ধ। মাঝে মাঝে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে 'সন্ধি' হয়, কিন্তু ভেঙ্গে যেতে বেশি দেরী হয় না! এই পরিস্থিতি কি আদৌ বাঞ্ছনীয়? সরকারি কাজকর্মে গতিশীলতা আনতে এবং গণতন্ত্রের পীঠস্থান পার্লামেন্টকে সচল করার উদ্দেশ্যে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সমঝোতা অত্যন্ত জরুরি। সামান্য সামান্য ওজুহাতে পার্লামেন্টকে বন্ধ করার অধিকার কোনও সদস্যের নেই! বিশেষ করে বিরোধী পক্ষকে তাদের অতীত গৌরব স্মরণ করে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। তাঁর সেই মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য সংসদের প্রতিটি সদস্যের। সদস্যদের এ-কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার।

টুলো পণ্ডিত

নবকুমার ভট্টাচার্য

এখন রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণ। সবেমাত্র নীড় না ছাড়া পাখির কলকাকলিতে ঘোষিত হয়েছে জাগরণের নির্দেশ। তথাপি সমগ্র লোকালয় এখনও নিদ্রামগ্ন। পথঘাট স্বভাবতই নির্জন। সূর্যালোকে আলোকিত হওয়ার প্রতীক্ষায় পৃথিবী। পূর্ব দিকচক্রবালে রঙ বদলের ঈষৎ আভাস মাত্র। 'ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী শশী ভানুঃ সূর্যো সুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতব কুর্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্'। নিত্যদিনের মতো পাঠ করলেও এইক্ষণে অন্য ভাবনায় ভাবিত তিনি। শয়নকক্ষের অর্গল মোচন করে এসে দাঁড়ালেন গৃহসংলগ্ন আঙিনায়। বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ শরীর। নগ্নগাত্রে শ্বেতশুভ্র যজ্ঞোপবীতের বেষ্টনী, মস্তকের শিখায় তিনি জ্যোতির্ময়। সদাহাস্যময় এই মানুষটি এই মুহূর্তে প্রগাঢ় চিন্তায়। তিনি চিন্তিত কারণ গতকাল তিনি ন্যায়সূত্রের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে তিনি নিজেই তৃপ্ত হতে পারেননি। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল কিছু যেন বাকি রয়ে গেল। তারপর থেকেই নতুনতর ব্যাখ্যার ব্যাকুলতায় তাঁর চিত্ত অস্থির। স্বভাবতই গত নিশাকাল তিনি জাগ্রতই ছিলেন। এখন এই নিশান্তের নির্জনতায়ও তাঁর অন্বিষ্ট মন একই ভাবনায় বিভোর। আঙিনায় দীর্ঘক্ষণ পদচারণা করে অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন নতুন এক জিজ্ঞাসার উত্তর। প্রসন্নচিত্তে তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করলেন আকাশের দিকে। ইতিমধ্যে প্রভাতের সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। এই অনন্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়ল নিজের পিতার কথা। মহামহোপাধ্যায় সেই মানুষটি সব সময়ই বলতেন, জ্ঞান এই আকশের মতোই অনন্ত। পিতাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে প্রশান্ত মনে স্নান, আহ্নিক, গৃহদেবতার পূজার্চনা সেরে এসে আসন গ্রহণ করলেন তাঁর নিজের টোলে। ধীরে ধীরে গুরুগৃহে ছাত্রদল এসে উপস্থিত হলো। শুরু হলো বিদ্যাভ্যাস। একদিকে নবাগত ছাত্ররা আবৃত্তি করে চলেছেন— অমরা নির্জ্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিধুধাঃ সুরাঃ, সুপর্ব্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ...ইত্যাদি। অন্যদিকে তিনি বেদান্তের ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেত, অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে বাক্যের। এখানে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠক্রম শেষ করার জন্য কারো নির্দেশ নেই। শিক্ষা এখানে প্রকৃতই মনের খোরাক আনন্দের উপাদান। পণ্ডিতমশাই এই আনন্দযজ্ঞের ঋত্বিক।

এককালে আমাদের শিক্ষা ছিল গুরু পরম্পরা বাহিত। বাঙলার টুলো সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ ছিল তার নিদর্শন। সম্প্রদায় এবং সারস্বত সাধনার ধারা রক্ষাই ছিল তাঁদের জীবনের অভীষ্ট। আয় সামান্য হলেও ছাত্রদের গৃহে অন্ন দিয়ে পোষণ করতেন। গৃহকর্ম, সন্তান পালন আর ছাত্রদের অন্নদান ছিল সেকালের পণ্ডিতদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। ছাত্রবৃন্দ ছিল পণ্ডিতদের প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁদের কৃতিত্বেই পণ্ডিতের গৌরব। ছাত্রধারা রক্ষাই ছিল পণ্ডিতবর্গের ব্রত। পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহিণী মাতৃবৎ ছাত্রদের আহার্য ও সেবা করতেন। বুনো রামনাথের কাহিনী কেবল কাহিনীমাত্র নয়, এক চলন্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। পণ্ডিত মহাশয়রা ছিলেন বিলাসশূন্য। একখানি বস্ত্র, উত্তরীয় এবং সম্ভব হলে একজোড়া চটি। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা এই বেশেই দেখতে পাই। বুনো রামনাথের মতো অনেকেই কেবল গামছা পরে জীবন কাটিয়েছেন। কলকাতার শ্যামবাজারের পুরাণদাস অষ্টতীর্থকে অনেকেই এই বেশে দেখেছেন। জ্ঞানপ্রগাঢ় এই পণ্ডিত কেবল গামছা পরে নগ্ন পদে জীবন কাটিয়েছেন। হারানচন্দ্র শাস্ত্রী, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, রাখালদাস ন্যায়রত্নের মতো মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা কেবলমাত্র বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করেই ভারতবিখ্যাত হয়েছেন। শাস্ত্রের অধ্যাপনাই ছিল তাঁদের জীবনের সাধনা আর গ্রন্থরচনা ছিল গৌরবের বিষয়। এই কয়েকদশক আগেও খোদ কলকাতার টোলে ছাত্র রেখে পড়াতেন পণ্ডিত সন্তোষ কুমার স্মৃতিতীর্থ। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাবল্যে আজ সনাতনী বিদ্যাচর্চা অবহেলিত। টুলো শিক্ষাধারাকে প্রাচীনত্বের ছাপ মেরে তাকে আধুনিক জীবনের অনুপযোগী বলে উপহাস করা হচ্ছে। টিকিধারী টুলো পণ্ডিতকে কৌতুকের পাত্ররূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে আমাদের গল্প উপন্যাসে। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে টুলো পণ্ডিত উপস্থাপিত হয়েছেন ভাঁড়ের ভূমিকায়। তবে টুলো পণ্ডিতদের উপহাস করলেও তাদের আদর্শটি উপেক্ষার বস্তু নয়। স্যার উইলিয়াম জোনসের মতো যাঁরা পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ রূপে। তাঁদের সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু টিকিধারী টুলো পণ্ডিতেরা। পশ্চিমবঙ্গে এখন সাতশোর মতো টোল থাকলেও টুলো পণ্ডিতের গরিমা আজ অস্তমিত।

টুলো পণ্ডিতদের নিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে এক বেদনাবিধুর কাহিনী লিখেছেন।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদামণি

অর্ণব নাগ

পয়লা জানুয়ারি দিনটা এগিয়ে এলে সততই মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হবার কথা। তবে ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন (যাকে ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যরা 'আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান' বলে অভিহিত করেছেন) গৃহী ভক্তদের কাছে, সর্বস্বত্যাগীদের কাছে নয়। বস্তুত কাম-কাঞ্চনত্যাগী শিষ্যদের কাছে কল্পতরু হবার জন্যে কোনও বিশেষ দিনের দরকার তাঁর পড়েনি। কারণ সংসার তাপে জর্জরিতদের চাওয়া-পাওয়ার নিরিখে হাজার রকমের মনোবাসনা থাকতে পারে, এঁদের জন্য একটা বিশেষ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হতেই পারেন। কিন্তু ত্যাগীরা তো তাঁকে পেয়েই ধন্য, আরও ভালভাবে বললে সর্বক্ষণই তাঁর আদর ও ভালবাসা পেয়ে সব পেয়েছির দেশে চলে গিয়েছিলেন এঁরা। নিজের আধ্যাত্মিক জীবন দিয়েই এঁদের জীবনপাত্র ভরে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সুতরাং তাঁদের জন্য আলাদা কোনওদিন 'কল্পতরু' হবার দরকার পড়েনি ঠাকুরের। কিন্তু ভক্তহৃদয়ের চিরকালীন জিজ্ঞাসা— নিজের সহধর্মিণী সারদাদেবীকে কী দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়েও করা যেতে পারে, কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের পরশ কি রামকৃষ্ণ-জায়া পাননি? পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের কাছে মার্জনা চেয়ে নেব, কারণ উত্তরটা অনুসন্ধানের চেষ্টা করব ঠিকই কিন্তু সমাধানে পৌঁছনোর স্পর্ধা দেখাব না।

একথা আমাদের জানা, দক্ষিণেশ্বরের নহবত-বাসিনী কাশীপুর উদ্যানবাটীতেও অবগুণ্ঠনবতী-ই ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সংবরণের পর নিজেকে সামলাতে না পেরে উদ্যানবাটীর যে ঘরে ঠাকুরের দেহ শায়িত ছিল সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে, 'মা কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো' বলে কেঁদেছিলেন। শ্রীমা ঠাকুরের ফটো পুজো করেছিলেন, খবরটি বহুল প্রচারিত হলেও তিনি যে ঠাকুরকে স্বয়ং মা কালী রূপেই দেখেছিলেন এ সংবাদ সর্বজনজ্ঞাত নয়। বরং তিনি নিজেই যে পরবর্তী সময়ে ভক্তের কাছে, মায় তেলোভেলোর জঙ্গলে তাঁর 'ডাকাত-বাবা'র কাছেও একদা স্বয়ং কালী রূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন তা সকলের জানা। শ্রীমায়ের এহেন দৈবী-প্রকাশের পেছনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণ তিনি শ্রীমুখে বলেছিলেন, 'ওই যে মন্দিরে মা (দক্ষিণেশ্বরে পূজিতা কালীমূর্তি ভবতারিণী) রয়েছেন, আর এই নহবতের মা (সারদা দেবী)— অভেদ।' সবমিলিয়ে ঠাকুর আর মা-র মধ্যে যুগপৎ যে ভক্তরা মা কালীর সন্ধান পেতে চান তাঁদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। গঙ্গার ঘাটে ধ্যানরতা যোগীন-মার সামনে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীমা-র সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওকে-একে অভেদ জানবে।' ভক্তমনে প্রশ্ন জাগে, মা সারদার কালীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনা কি শেষপর্যন্ত শ্রীশ্রীমাকেই কালীরূপে উপাস্য করে তুলেছিল? আর যদি তাই হয়ে থাকে তবে এর পেছনে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাদের ভূমিকা কিন্তু অবিসংবাদিত।

পার্থিব সম্পত্তি বলতে ঠাকুর মা সারদার জন্য রেখে গিয়েছিলেন কামারপুকুরে একটি মাটির কুটির আর শ'চারেক টাকা। সখীভাবে সাধনের সময় মথুরবাবু ঠাকুরকে যেসব অলংকার দিয়েছিলেন তাই বেচেই ওই টাকাগুলো পাওয়া। ওগুলো জমা ছিল বলরাম বসুদের জমিদারিতে। যার সুদ পাওয়া যেত বছরে ত্রিশ টাকা, অর্থাৎ মাসে আড়াই টাকা। ঠাকুর মাঝে-মধ্যে সহাস্যে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা একজন ব্রাহ্মণ বিধবার মাসে দু'টাকা হলেই হয়ে যায়, কি বল?' কীরকম হয়, সেটা ঠাকুর বোধহয় নিজেও যানতেন। তাই মা সারদাকে বলেছিলেন, 'এই রইল তোমার মেটে ঘরটি। শাকভাত রেঁধে খাবে আর হরিনাম করবে।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও জানতেন 'লাউশাকখাকী, পুঁইশাকখাকী'কে তিনি বিয়ে করেননি। বিয়ে করেছেন 'জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী'কে। যাঁকে নিজের 'শক্তি'রূপে দেখেছেন। অভিহিত করেছেন 'মা আনন্দময়ী' বলে। আর সেই কারণেই লোক-লীলা সংবরনের পূর্বে মা সারদার হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেলেন মহাদায়িত্ব, 'দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' বিস্মিত হয়েছিলেন মা সারদা, 'আমি মেয়েমানুষ। তা কি করে হবে?' নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে উনিশ শতকের সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে। শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়?'

আর এই দায় বহনের জন্য শ্রীমা-কে কীভাবে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন তিনি তার একটি কৌতুককর বিবরণ মেলে অক্ষয়কুমার সেনের রামকৃষ্ণ-পুঁথিতে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-মণ্ডলীতে প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কালীপদ ঘোষ (দানাকালী)-এর একটা আলাদা স্থান রয়েছে। তাঁর শ্যামপুকুরের বাড়িতেও শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্বে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত

মানুষদের যেমনটা হয় সেইভাবেই কুসঙ্গে এবং অপরিমিত মদ্যপানে কুকর্মে লিপ্ত ছিলেন দানাকালী। তাঁর স্ত্রী ঠাকুরকে বোধহয় ভেবেছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সাধু-টাধু কিছু হবেন। তাই তাবিচ-কবচ কিংবা ওষুধ-টষুধ কিছু একটা চেয়ে বসলেন ঠাকুরের কাছে, যাতে অলৌকিক উপায়ে তাঁর স্বামীর সুমতি ফেরে। এই অলৌকিকতাকে ধর্মজীবনের অন্তরায় বলে চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করেছেন। তাঁর দৈবী প্রভাব কিংবা আধ্যাত্মিক প্রভাব কীভাবে দস্যু রত্নাকর থেকে মানুষকে বাল্মীকিতে পরিণত করতে পারে গিরিশ ঘোষ-ই তার প্রমাণ। অনুরূপভাবে কালীপদ ঘোষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু এখন কালীপদ-জায়া অলৌকিক ওষুধ যাঞ্চা করায় রঙ্গপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণের একটু মজা করার ইচ্ছে হলো। সেইসঙ্গে শ্রীশ্রী মা-কে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করারও। তিনি কালীপদ-র স্ত্রী-কে নহবতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন, ''সেখানে এক স্ত্রীলোক আছেন, তাঁকে তুমি সব খুলে বললে তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। তাঁর এসব মন্ত্রৌষধি জানা আছে, এবিষয়ে তাঁর শক্তি আমার চেয়ে বেশি।'' সরল বিশ্বাসে কালীপদ পত্নী গেলেন শ্রীশ্রীমার কাছে। মা সারদা ঠাকুরের রসিকতা বুঝতে পেরে তাঁকে ঠাকুরের কাছেই ফেরত পাঠালেন। এরপর এখনকার সরকারি অফিসের কেরাণীর ঢঙে ঠাকুর ফের তাঁকে পাঠালেন মায়ের কাছে। এরকম বারতিনেকে ঠাকুর— মা আর মা— ঠাকুর করতে দেখে ব্যথিত-হৃদয় সারদাদেবী পুজোর একটা বেলপাতা আর খানিক সান্ত্বনা দিয়েই বিদায় করলেন সংসার জ্বালায় জর্জরিতা সেই নারীকে। ভবিষ্যত সাক্ষী দেয় শ্রীশ্রীমার এই আশীর্বাদ সেদিন বিফলে যায়নি। কালীপদ ঘোষের সুমতি এমন ফিরেছিল যা তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে অক্ষয় করে রেখেছে। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 'শক্তি'কে জগৎপূজ্য করে গেলেন স্বকর্ম-প্রয়াসে।

রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে বিশ্বব্যাপী করে তুলতে যে ঘটনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য যাত্রা। মা সারদা না থাকলে স্বামীজী'র মার্কিন দেশে জয়যাত্রা আদৌ সম্ভব হোত কিনা, একেক সময় এই সন্দেহও সন্দিহান মনে উঁকি দিয়ে যায়। আমরা জানি, বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী এব্যাপারে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতদূর দেশে নরেন্দ্রনাথকে যেতে বলতে শ্রীমার মনে দ্বিধা থাকলেও শেষে ঠাকুরের নির্দেশে স্বামীজীকে অনুমতি দেন। আর তারপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কীভাবে স্বামীজীর মাধ্যমে ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়েছিল সে ইতিহাস সবাই জানেন।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপুজোর দিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে ষোড়শী জ্ঞানে যে পুজো করেছিলেন সে খবর ভক্তদের জানা। সুতরাং মায়ের পূজ্য রূপের পেছনে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান যে সমধিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীকালে এও দেখা গেছে তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদ একথা নিজমুখে মা সারদা বহুবার বলে ফেলেছেন। পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে একথাটা শ্রীরামকৃষ্ণও যোগীন মাকে বলেছিলেন। স্বামীজী এককালে বিনা তর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা কথাও মানতে চাইতেন না। কিন্তু মায়ের সঙ্গে তর্ক করা দূরে থাক, তাঁর একটা কথাও জীবনে অমান্য করেননি। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁর জ্ঞানসাগরে নিমজ্জিত করেছেন; সামান্য অক্ষর পরিচয় যুক্ত এক নারীর সামনে কিন্তু তাঁর সদা উচ্চশির নতশির হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। স্বামীজীর কাছে একটা ঘটনার কথা শুনেছিলেন কথামৃতকার শ্রীম। কাশীপুরে ঠাকুরের সেবার্থে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমার স্নেহের কথা উল্লেখ করে ভক্তরা বলেছিলেন, এমন মহৎ হৃদয় তাঁরা কখনও দেখেননি। একথা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আমার শক্তি কিনা, তাই এমন।' ঠাকুরের এই কথাগুলোর বাস্তব প্রতিফলন কিন্তু পরবর্তীকালে স্বামীজীর কথায় ও কাজে লক্ষ্য করা গেছে। একদিকে সঙ্ঘ জননীর জন্য তিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যদিকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রাম : ?', দাদা ওই যে বলছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন— যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের ওপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।''

একেক সময়ে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন 'কল্পতরু' হয়েছিলেন তাঁর গৃহীভক্তদের কাছে, ত্যাগীদের জন্য যেমন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই নিজের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছিলেন প্রতিমাময়ী মাতৃমূর্তিতে, যেভাবে নিজের চাপরাশ দিয়েছিলেন স্বামীজীকে। এই প্রসঙ্গে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন শ্রীমায়ের জীবনী লেখক পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ, ''আমরা যেন এই মহাভ্রমে পতিত না হই যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণেই শ্রীমা আজ জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। অধ্যাপনাশাস্ত্রের ইহা এক মৌলিক কথা যে, শিষ্যের শুভ সংস্কার না থাকিলে গুরুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত ও কার্যক্রম হয় না। আবার সেই শুভ সংস্কারের সহিত প্রয়োজন হয় শিষ্যের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতা। ঠাকুরের যুগধর্ম-প্রবর্তন চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী সেই দক্ষিণেশ্বরের জীবনকালেই আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার বিকাশোন্মুখ অসীম শক্তির সহিত পরিচিত থাকায় নিজ কার্যভার এই শক্তিরূপিণীর হস্তে তুলিয়া দিতে অতীব ব্যস্ত হইয়াছিলেন।'' তবে পরবর্তীকালে ভক্তদের এতধরনের আবদার মেটাতে হয়েছে মা সারদাকে যাতে করুণাময়ী মাতৃমূর্তির পাশাপাশি কল্পতরুমূর্তির প্রকাশও যে ঘটেছিল তা অনস্বীকার্য।

কৃতজ্ঞতা :
শ্রীমা সারদাদেবী : স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগজননী সারদা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত।
(শুভ 'কল্পতরু দিবস' ও মা সারদার পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

হোতু-কোতু উপাখ্যান

নতুন বছরের শুভেচ্ছাপত্র

বছর শেষে সকলকে শুভেচ্ছা জানায় হোতু। লিখে রাখে 'সকলের ভালো হোক।' বাংলা বছরে হইচই একটু কম। ইংরেজি নতুন বছরে মাতামাতি খুব বেশি। আগে নতুন বছরের প্রথম দিনে ছুটি থাকত। এখন না থাকলেও ছুটি ছুটি মেজাজ। হোতু অনেকগুলো শুভেচ্ছাপত্র পায়। নিজেও পাঠায় অনেককে। তিনটে ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কার্ড কেনে। আরও অনেককে কিনতে বলে। অর্জুনের দোকান থেকে কার্ড বিক্রিও হয়। তৈরির কাজ হয়। ওরা তিনজন ছাড়া আরও কয়েকজন রয়েছে। সকলে মিলে কাজ করছে। ওদের মিলেমিশে কাজ করাটা হোতুর খুব পছন্দের। হালকা বাজনা বাজে কিংবা গান। সেদিন বাজছিল রবিশঙ্করের সেতার! সাজানো গোছানো। সুন্দর কাজের পরিবেশ। হোতু ওদের জন্যে মিষ্টি নিয়ে গিয়েছিল। ওরা যত্নে চা তৈরি করে খাওয়ালো। অর্জুন গিয়েছিল সঙ্গে। তারও খুব পছন্দ জায়গাটা। কার্ড অর্জুন বেশি কিনল উপহার দিয়েছেন। আশিসদের সঙ্গে অনেকের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী কাজ করিয়ে টাকা দিতে দেরি করছিল। ঘোরাচ্ছিল বারবার। আশিসরা কিছু বলেনি ভোলাবাবুকে। বলেছিল হোতুকে। কথায় কথায় হোতু জানিয়েছিল ভোলাবাবুকে, 'আপনার পরিচিত মিথিলেশ পাণ্ডে আশিসদের টাকা দিচ্ছে না।' ভোলানাথ শীল সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেন মিথিলেশ পাণ্ডেকে। বলেন, 'আশিসদের টাকা

তিনটে ছেলেমেয়ের নাম প্রবীর আশিস শর্মিষ্ঠা। ওদের মধ্যে প্রবীর কথা বলতে পারে না। শোনারও অসুবিধে। আশিসের হাঁটাচলায় অসুবিধে থাকলেও সে ঘুরে ঘুরে কাজ করে। শর্মিষ্ঠা চোখে দেখতে পায় না। ওরা প্রায় সমবয়সী। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। কাছাকাছি বাড়ি। আশিস অনেকরকম কাজ করতে পারে। শর্মিষ্ঠার অন্তর্দৃষ্টি আছে। সে কত যত্নে একটার পর একটা কার্ড তৈরি করে। প্রবীর ভালো আঁকে। হাতের লেখাও ভালো। ওদের সঙ্গে হোতুর পরিচয় শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার স্টলে। কার্ড তৈরি করে বিক্রির ফাঁকে গান গাইছিল। রবীন্দ্রনাথের গান। শর্মিষ্ঠার গলা চমৎকার। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে দেখেছিল। ওদের বাড়ির লোকজন হয়তো। হোতু কার্ড কিনেছিল অনেকগুলো। ঠিকানা রেখেছিল। এখন তিনজন অনেক কার্ড তৈরি করে বাজারে দেয়। হোতু ওদের কাছে শুধু কার্ড কেনে না, অনেকভাবে সহযোগিতা করে। নিয়মিত খোঁজখবর নেয়। বলেছে, 'তোমাদের বেশি কষ্ট করে আসতে হবে না। সেলফোনে খবর দেবে। আমি চলে যাবো এক ফাঁকে।'

হোতু দেখেছে আশিসদের একটা ঘরে কার্ড দোকানের জন্যে। বলল, 'হিসেব করে বলো।' দাম দিলো সঙ্গে সঙ্গে। হোতুও কিছু কার্ড নিলো। দাম দিলো। আশিস দুটো কার্ডে অর্জুন আর হোতুর নাম লিখে উপহার দিতে দুজনেই খুশি।

হোতুকে নতুন বছরে অনেকে শুভেচ্ছা জানায় টেলিফোনে! কেউ কেউ সেলফোনে বার্তা পাঠায়। কোতু পরামর্শ দেয়, 'আপনিও ওরকম করতে পারেন। খরচ বাঁচবে, শুভেচ্ছাও জানানো যাবে।' হোতু কোনওরকম গুরুত্ব দিলো না সে-কথাকে। বলল, 'তুমি ডাকঘর থেকে দুশোটাকার ডাক টিকিট কিনে আনবে। কার্ড পাঠাতে হবে চটপট।' হোতু দু-তিন দফায় প্রায় শ'খানেক শুভেচ্ছাপত্র পাঠায় একে ওকে-তাকে। হোতুকে শুভেচ্ছা জানায় অনেকে। সব কার্ড যত্নে রাখে।

ছোটোদের আঁকা লেখা শুভেচ্ছাপত্র গুরুত্ব পায় তার কাছে। কাগজব্যবসায়ী ভোলানাথ শীল হোতুর পরিচিত। সজ্জন মানুষ। হোতুর অনুরোধে আশিসদের তিনি কাগজ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। লাভ একটুও না রেখে কাগজ দিয়েছেন। এবং বলেছেন, 'সুযোগ-সুবিধে মতো টাকা দেবে তোমরা।' তাছাড়া বেশ কিছু কাগজ আমার কাছে আগামীকাল দুটোর মধ্যে দিয়ে যাবেন। নয়তো পরে কখনও আমার দোকান থেকে ধারে কাগজ পাবেন না।' মিথিলেশ জানত ভোলা শীল এককথার মানুষ। আশিসদের কাছে গিয়ে মিথিলেশ পাণ্ডের দেওয়া টাকা পৌঁছে দেন ভোলানাথ। নিজের দোকানে ক্যালেন্ডার করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দাম দিয়েছেন। ভোলাবাবু আরও বলেছেন, 'আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব করবো! তোমরা এগিয়ে চলো।'

হোতু মাঝেমাঝেই শুভেচ্ছাপত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেওয়ার অভ্যেস গড়ে তুলতে বলে অনেককে। অর্জুন মানে হোতুর যুক্তি। সে সাজিয়ে রাখে। পছন্দ করে নেয় অনেকে। সে বাংলায় শুভেচ্ছা লিপির পক্ষে কথা বলে সবসময়। বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা কেন লিখবে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার!' অর্জুনের অনুরোধে শুভেচ্ছাপত্রে লেখা : 'নতুন বছরের দিনগুলো সুখে আর আনন্দে ভরে উঠুক।' ইংরেজি নতুন বছরে অর্জুন বাংলায় লেখা কার্ড বেশি রেখেছে। বিক্রিও ভালো হয়েছে।

পরামর্শটা হোতুরই ছিল। সে খুশি অর্জুনের দোকানে ভিড় দেখে।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

বছর শেষে বইয়ের প্রদর্শনী

ছোটোদের বইয়ের প্রদর্শনী হয় রিয়াদের নাচগানের স্কুলে প্রতিবছর ডিসেম্বরের শেষ শনি আর রবিবার। সুন্দর করে সাজানোর ব্যবস্থা থাকে। বই বেছে বেছে কিনে আনা হয় কদিন আগে থেকে। ছোটোদের নানারকম বই আসে। ভালো বই চাই। ছোটোরা বই দেখবে। বেছে নেবে। প্রত্যেকে দুটো করে বই নিতে পারে। এটা ছোটোদের সংস্থার পক্ষ থেকে উপহার। প্রতিবছর কয়েকজন টাকা দেন বই কেনার জন্যে। সুন্দর শুভেচ্ছাপত্র তৈরি হয়। তাতে লেখা থাকে বইপড়া আর বইকে ভালোবাসার কথা। তা পেজমার্ক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। বই সাজানো থাকে জোরালো আলোর নিচে। টেবিলে টেবিলে সাজানো রঙিন বই। ঝলমল করে ওঠে। আর সেগুলো যখন ছোটোরা হাতে তুলে নেয় তখন বই যেন প্রাণবন্ত রূপ নেয়। ছোটোরা বই হাতে পেয়ে দারুণ খুশি। একের পর এক বই উল্টে যায়। বড়োরা বলেন, 'খুশিমতো বেছে নাও।' সুন্দর ব্যাগে বই আর শুভেচ্ছাপত্র ভরে তুলে দেওয়া হয় ছোটোদের হাতে। ডিসেম্বরের শুরুতে ছোটোরা বলে, 'এবার কবে হবে বই-প্রদর্শনী?' বড়োরা জানিয়ে দেন, 'আর কয়েকদিন বাদেই।' ছোটোদের আগ্রহ বইকে ঘিরে বাড়ুক— এটা সংস্থার সকলে চান।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. পণ্ডিত রবিশঙ্কর কোন্ বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন? কোন্ সালে তাঁকে 'ভারতরত্ন' সম্মান জানানো হয়?

২. রবিশঙ্করের দাদার নাম কি? তিনি কেন বিখ্যাত? কোন্ বিখ্যাত চলচ্চিত্র তাঁর সৃষ্টি?

৩. সত্যজিৎ রায়ের কোন্ কোন্ ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর?

৪. কত বছর রবিশঙ্কর সেতার বাজিয়েছেন?

৫. রবিশঙ্করের গুরু কে ছিলেন? তাঁর মাতৃভাষা কি?

উত্তর : ১. সেতার। ১৯৯৯। ২. উদয়শঙ্কর। নৃত্যশিল্পী হিসেবে। কল্পনা। ৩. পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, পরশপাথর। ৪. সাত দশকের বেশি। ৫. ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। বাংলা।

ছবিতে তফাত খোঁজা

উল্টো পাল্টা

রজতকে বললেন বাংলার মাস্টারমশাই প্রশান্ত নিয়োগী, 'বাবাকে একটা চিঠি লেখো নিজের প্রয়োজন জানিয়ে।' একটু ভেবে রজত লিখে ফেলল, 'বাবা, খেতে পাচ্ছি না। চটপট টাকা পাঠাও জুতো কিনতে হবে। টাকা বাঁচলে আইসক্রিম খেতে পাবো।'

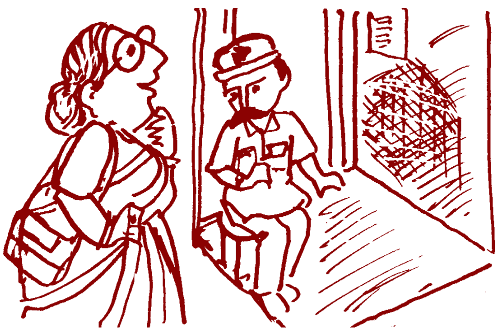

২

শীতকালে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে কুমার গুপ্ত বললেন, 'প্রকৃতি বড় বেরসিক। অসময়ে বৃষ্টি কি ভালো লাগে!' যাঁকে শুনিয়ে বলা, তিনি কোনও কথা মুখ বুজে হজম করেন না। কানে পুরো বাক্যটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জবাব তৈরি। ওই কথা শুনে বলে উঠলেন, 'প্রকৃতির প্রকৃতি যদি অত সহজে তুমি চিনতে পারো তাহলে নাম প্রকৃতি হলো কেন?'

৩

খুব হন্তদন্ত করে এক ভারিক্কি চেহারার ভদ্রমহিলা অফিস বাড়ির সামনে হাজির। লিফটচালককে বললেন, 'নাইনথ ফ্লোরে চলুন।' লিফটচালক জিগ্যেস করলেন, 'কার সঙ্গে দেখা করবেন?' ভদ্রমহিলা একটু রেগে বললেন, 'তাও কি আপনাকে জানাতে হবে?' লিফটচালক বললেন, 'জানতে চাওয়ার কারণ এ বাড়িটা আটতলা।'

রামগরুড় সংকলিত

অঙ্গনা

বর্ষশেষে বাংলার উজ্জ্বল তিন মহিলার কথা

ইন্দিরা রায়

একটা কথা আমরা জানি সব ভালো যার শেষ ভালো। ২০১২-য় আজ শেষদিন। তিনশ পঁয়ষট্টিটা দিন পেরিয়ে গেল নানা টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। এরই মধ্যে কিছু হিন্দোলও জাগিয়েছে এমন কিছু ঘটনা। মানুষ সবকিছু মেনে নিয়েই দিন কাটিয়ে গেছে সারা বছর। এর মধ্যে মহিলামহলে আবার কিছু আলোর দিশা দেখা গেছে বছরের শেষে। বিশেষ কিছু মহিলার দৃষ্টান্তমূলক কাজ অঙ্গনার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বর্ধমান জেলার কালনার শাসমূল গ্রামের পুণ্যলক্ষ্মীতলার এক নাবালিকার দুঃসাহসিকতা। মেয়েটির নাম মিতালি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। পড়াশোনায় মোটামুটি ভাল। বাড়ির অবস্থা দারিদ্র্যসীমার মধ্যে। বাবা কাঠমিস্ত্রি, নাম মহানন্দাভক্ত। বলিষ্ঠ দৃঢ় মিতালি চেয়েছিল লেখাপড়া শিখে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা লাঘব করবে। এভাবেই চলছিল দিন। হঠাৎই ও জানতে পারে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে। শুধু ঠিক নয়, বিয়ের দিনক্ষণও ঠিকঠাক। একথা শোনামাত্রই মিতালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে বিয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওর কথায় কান দেয়নি বাবা-মা। ইতিমধ্যে ও জেনেছে রেখা কালিন্দী, বীণা কালিন্দী, আমাসারা খাতুনের কথা। ওরাই ওর প্রেরণা। সাহসে ভর করে দু' বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সোজা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় সে। প্রশাসন নড়েচড়ে বসায় বিয়ে ভেস্তে যায়। গোটা বিষয়টা জানিয়ে বিডিও নিষ্পত্তির আর্জি জানান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরাই উদ্যোগ নিয়ে কালনা থানায় যোগাযোগ করে বিষয়টা হস্তক্ষেপ করতে বলেন। অভিভাবকদের বোঝানো হয় যে নাবালিকা বিবাহ দেওয়া আইনত দণ্ডনীয়

অদিতি মুখার্জি

অপরাধ। সাবাস মিতালি, আলোর দিশা দিল তারই বন্ধুদের এবং সেইসঙ্গে তাদের সতর্কও করল।

আরেকটি আলো জ্বাললেন মেদিনীপুর জেলার অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষিকা। সাধারণভাবে প্রত্যেক মানুষই তার অবসরের পর পাওনা টাকা পেয়ে তা জমা রাখতে চান ভবিষ্যতের জীবনের জন্য। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পুষ্প সাঁতরা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দেখালেন। তিনি নিজের অবসরপ্রাপ্তির পর বকেয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে দান করলেন। পুষ্প সাঁতরা পাঁশকুড়া সেনবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। হঠাৎ কেন প্রতিবন্ধীদের জন্য অর্থ দান,— হঠাৎ নয়। আমি এভাবে বিভিন্ন খাতে টাকা দিয়ে থাকি সমাজসেবামূলক কাজের জন্য। তো আমি কিছুদিন আগে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে দৃষ্টিহীন একটি প্রতিবন্ধী ছেলের গান শুনে ঠিক করি, এদের উন্নতিকল্পে কিছু অর্থ দান করব। এই বিদ্যালয়টি হলো তমলুকের নিমতৌড়ি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। পুষ্প সাঁতরা শুধু শিক্ষিকা নন, লেখালেখিতেও খুব দক্ষ। তাঁর এই উদারতা ও মহানুভবতা অবশ্যই ভবিষ্যতে অনেককে প্রেরণা দেবে।

কিছুদিন আগে অঙ্গনার পাতায় এক মহিলা গবেষকের কথা প্রকাশিত হয়েছিল যিনি খরাপ্রবণ এলাকায় কৃষিকাজের সহায়তা হিসেবে বাংলা থেকে সুদূরে থেকেও বাংলার চাষীভাইদের জন্য এমন এক পদক্ষেপ নিয়েছেন নিরলস গবেষণায়--- যার জন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি এক বাঙালি তরুণী অদিতি মুখার্জি। অদিতি কলকাতার মেয়ে, পড়াশোনাও এখানে। তাঁর গবেষণার বিষয়ে চাষের ক্ষেত্রে সেচব্যবস্থায় যেসব সমস্যা তা দূর হবে, চাষের ক্ষেত্রে উন্নততর হবে। গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বের প্রশংসনীয় পুরস্কার অর্জন করেছেন। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৯০,০০০ টাকা। তাঁর এই কাজে পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার কৃষক উপকৃত হবে। গত অক্টোবরের সতেরো তারিখে তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ আর্থিক পুরস্কার লাভ করেন।

শুধু বাংলা ও বাঙালির, বিশেষত মহিলাজগতের গর্ব নয়, বিশ্বের নারীদের কাছেও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বছর শেষে শুধুমাত্র বাঙালি মহিলাদের সাহসিকতা, মহানুভবতা এবং দেশের স্বার্থে পরিশ্রমলব্ধ সম্মান গবেষণা অবশ্যই আনন্দের। মেয়েদের আরও অনেক অগ্রগতি এবং কৃতিত্ব নতুন বছরেও অবশ্যই আশা করব।

সাংবিধানিক পদে সজ্জনরা আসুন

অতিথি কলম

ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

সরকারের দুর্নীতি দমনের দায় যাদের ওপর ন্যস্ত তারাই ব্যাপকভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষরা নির্বাচিত হচ্ছে এটা নতুন কিছু নয়। লোকেরাই জার্মানীতে হিটলার এবং ইন্দোনেশিয়াতে সুকর্ণকে ক্ষমতাসীন করেছে। মনে হয় নির্বাচকরা সৎ ব্যক্তিদের ক্ষমতাসীন করে না কারণ ভাল, সৎ মানুষরা ভাল সরকার চালাবে এমন ভরসা তাদের নেই যেমন একজন তস্কর পরিবেষ্টিত সাধু ট্রেন ভ্রমণকালে চোরদের চৌর্যবৃত্তি রুখতে ভয় পান। আমাদের উচিত হলো এইসব অসাধু, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের এক সূত্রে বেঁধে ফেলা।

এই প্রেক্ষাপটে সাংবিধানিক পদগুলি যেমন রাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধান বিচারপতি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনার এবং কেন্দ্রীয় লেখ আয়োগ প্রভৃতি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই পদস্থ আধিকারিকগণের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু এঁরা যথোপযুক্তভাবে তা প্রয়োগ করেন না। উল্টে এঁরা নিজস্ব লাভের জন্য সরকারকে সহযোগিতা করেন। আর এই জন্যই সরকার খুল্লাম- খুল্লা দুর্নীতি করে যাচ্ছে এবং দুর্নীতি সর্বব্যাপী হচ্ছে। দুর্নীতি দমনে এই সব আধিকারিকগণ নির্ভয়ে এবং গম্ভীরভাবে তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

অতীতের রেকর্ড আমাদের অনুপ্রাণিত করে না। যেমন তৎকালীন প্রধান ন্যায়াধীশ চন্দ্রচূড় ইন্দিরা সরকারের জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছেন। তবুও আমার মনে পড়ছে পরবর্তীকালে তিনি তা নিয়ে অনুতপ্ত হন। বরিষ্ঠ আইনজীবী শান্তিভূষণ এমন আটজন বিচারকের তালিকা তৈরি করেছেন যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত। সম্প্রতি সিভিসি প্রধান পি জে টমাসকে সরে যেতে হয় কারণ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতির মামলা ঝুলে রয়েছে। এইভাবে যাঁদের হাতে দুর্নীতি দমনের চাবিকাঠি তাঁরাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।

সমস্যা হলো এঁদের নিয়োগেও দুর্নীতি জড়িত। শাসকদল এঁদের নিয়োগ করে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি মুখ্য বিচারপতি নিয়োগ করেন। ঐতিহ্যগতভাবে বরিষ্ঠ বিচারক এই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিন তিনজন প্রবীণতম বিচারককে টপকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজের পছন্দের এক বিচারককে নিযুক্ত করেন প্রধান বিচারপতি পদে। প্রধানমন্ত্রী এইভাবে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারককেও নিয়োগ করতে পারেন।

দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেশের সব ভোটার অংশ নিক। তাহলেই রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ পছন্দমতো প্রার্থী দাঁড় করাতে পারবে না। আম-জনতার রায় তাদের নিতেই হবে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা আহরণ করবেন দেশবাসীর কাছ থেকে, কোনও শাসকদলের কাছ থেকে নয় এবং তাহলেই সরকারের কাছ থেকে আসা কোনও অন্যায়, অন্যায্য, অনৈতিক প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতি সব দলের সাংসদ এবং বিধায়কদের দ্বারা নিযুক্ত হন। আবার এখানেও শাসকদলের ইচ্ছেমতো প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে থাকেন, বিরোধীদের মতামত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। পরিণাম আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। সিবি আইয়ের ক্ষেত্রে প্রবীণতম ব্যক্তি-ই নির্বাচিত হবেন এমন নয়। ওই পদের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর পছন্দমতো এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারেন। সিভিসি নিয়োগপন্থা আবার অন্যরকম। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিরোধী দল নেতার তৈরি কলেজিয়াম একটি অভিন্ন নাম সুপারিশ করবে রাষ্ট্রপতির কাছে। পি জে টমাসের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠায় ওই কলেজিয়াম। বিরোধী-নেত্রী সুষমা স্বরাজের মতে ওই সময় টমাসের বিরুদ্ধে যে এক দুর্নীতির মামলা ঝুলে রয়েছে তা কলেজিয়ামকে জানানো হয়নি। তথাপি শ্রীমতী স্বরাজ টমাসের নিযুক্তি নিয়ে এক বিরোধী নোট দিলেও সরকার তা অগ্রাহ্য করেছিল। মামলা যখন উচ্চতম আদালতে যায় তখন টমাস বাধ্য হন পদত্যাগ করতে। এর অর্থ হলো বিরোধী নেতার মতামত গৃহীত না হলেও এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

উন্নত দেশগুলিতে এই সমস্ত নিয়োগে বিরোধীদের ঘাড়ে দায়ে চাপিয়ে পলায়নের পথ খোঁজে সরকার। মার্কিন মুলুকে রাষ্ট্রপতি ৬ জন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করেন যা সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। বৃটেনে দশজন নির্বাচন কমিশন সরাসরি দায়বদ্ধ সংসদের কাছে। নির্বাচন কমিশনের কর্মপদ্ধতি তদারকি করার জন্য সর্বদলের

সদস্যদের নিয়ে গঠিত এক সংসদীয় প্যানেল গঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়া নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত হন এক বর্তমান বা প্রাক্তন ফেডারেল আদালতের প্রধান বিচারকের মাধ্যমে। এই কমিশন আবার সরকারের অধীনে। কানাডায় নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হয় হাউস অব কমনসে সর্বদলীয় এক সভায় এক প্রস্তাব পাশ করে। এইসব দেশে বিরোধী দলগুলির বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগদানের বিষয়টা প্রশাসনের ব্যবস্থাকে বেশি স্বচ্ছ করে। যাইহোক এই বিষয়ে একটু তফাত রয়েছে।

এই দেশগুলির আয় অনেক বেশি এবং এই দেশগুলির লোকজন দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুনানি শোনে। প্রতিদিনের জীবনে দুর্নীতির বিষয় বিশেষ রেখাপাত করে না। এখানে আবার ধারাবাহিকতার বিষয়টা আসছে। ভারতীয় ঐতিহ্য বা ধারাবাহিকতা হলো অনেক বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক যা পাশ্চাত্য দেশের ক্ষেত্রে অমিল এবং পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সবকিছুই প্রতিষ্ঠানিক। সুতরাং টমাসের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধী-দলনেত্রীর উপস্থিতি একইরকম নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব নিয়োগ শাসকদলের কুক্ষিগত থাকবে ততক্ষণ এই অবস্থার উন্নতি সুদূর-পরাহত। এইসব নিয়োগের ক্ষেত্রের বিকল্প উপায়ের উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি।

ফ্রান্সের মত দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেশের সব ভোটার অংশ নিক। তাহলেই রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ পছন্দমতো প্রার্থী দাঁড় করাতে পারবে না। আম-জনতার রায় তাদের নিতেই হবে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা আহরণ করবেন দেশবাসীর কাছ থেকে, কোনও শাসকদলের কাছ থেকে নয় এবং তাহলেই সরকারের কাছ থেকে আসা কোনও অন্যায়, অন্যায্য, অনৈতিক প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করতে পারবেন। যে দল তাঁকে নির্বাচন করেছে তাকে না করার মতো ক্ষমতা তাঁর থাকবে না।

প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হবেন বিভিন্ন রাজ্যের বার-কাউন্সিলের কর্তাদের দ্বারা তৈরি কলেজিয়ামের অনুমতিক্রমে। সি এ জি নিযুক্ত হবেন রাজ্যে রাজ্যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা। সি ভি সি নির্বাচন হতে পারে চার শঙ্করাচার্য, খৃস্টান, জৈন, মুসলমান এবং শিখ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধানদের তৈরি কলেজিয়াম দ্বারা। অন্য উপায়ও ভাবা যেতে পারে। মুখ্য বিষয় হলো এইসব সাংবিধানিক পদগুলির নিয়োগ শাসকদল বর্জিত হতে হবে যেখানে দূরতমভাবেও শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ না থাকে।

শাসকদলের মাধ্যমে এইসব নিয়োগ মানুষের সুবিধার থেকে দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে। মানুষ এগিয়ে আসুক তাদের বিধায়ক, সাংসদ নির্বাচনের মতো রাষ্ট্রপতি এবং লোকপাল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও।

অবশ্য এইসব বিকল্পপন্থা রাজনৈতিক দলগুলিকে বিস্তর অসুবিধায় ফেলে দেবে। এইসব প্রস্তাবিত কলেজিয়াম আমূল পরিবর্তন করবে গোটা ব্যবস্থাটাকেই। সরকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বহুমুখী নিয়ন্ত্রণই সক্ষম হবে সরকারকে সুপথে চালনা করতে।

(সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি, ২৭ জানুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—
রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩
ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

জাল নোটের কারবার মালদা প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা ॥ মালদা জেলা জুড়ে জাল নোটের রমরমা এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের জাল নোটের কারবার বেড়ে চলায় সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি পুলিশ প্রশাসনেরও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। প্রায় প্রতিদিন পুলিশের জালে ধরা পড়ছে জাল নোট ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে মালদা জেলার বৈষ্ণব নগর ও কালিয়াচক থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এদেশে চলে আসছে। গত ১৪ ডিসেম্বর একদিনেই পুলিশ ৯ লক্ষ টাকার জাল নোট ধরেছে। গত ১২ ডিসেম্বর বুধবার ৩ লক্ষ টাকার জাল নোটসহ দুইজন ধরা পড়েছিল। এদের মধ্যে বৈষ্ণব নগর থানার শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের সদস্য মুজিবর রহমানের ছেলে ইমন হোসেন ছিল। একের পর এক বৈষ্ণবনগর ও কালিয়াচক থানা এলাকা থেকে জাল নোট ধরা পড়ায় এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)-এর প্রতিনিধিরাও বিভিন্ন সূত্রে মালদার ওই দুই থানা এলাকায় হানা দিয়ে সাফল্য পেয়েছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে জম্মু ও কাশ্মীরের হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জাল নোট কারবারীদের যোগসূত্র রয়েছে। তাছাড়া বৈষ্ণবনগর থানার মোহনপুর চরিঅনন্তপুর ও কুম্ভীরা গ্রামগুলিকেই নিজেদের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলেছে জাল নোট কারবারিরা। মূলত ওই গ্রামগুলির ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তারা বিহার ও ঝাড়খণ্ডে জাল নোট পাচার করছে। কেননা এই গ্রামগুলি থেকে খুব অল্প দূরত্বেই রয়েছে রাজ্যের সীমানা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। আর এই দুই রাজ্য থেকেই জাল নোট পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের সর্বত্র। একই দিনে অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে নেপালে পাচার হওয়ার আগেই ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট ধরা পড়ে এবং সেখানেও মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের তিনজন ধরা পড়ে। এরা হলেন সারাফ আলি, দিলদার শেখ ও সুলেমান আলি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৫০০ এবং ১০০০ টাকার জাল নোট বাংলাদেশ থেকে এপারে চলে আসছে। যেহেতু নেপালে ভারতীয় টাকা চালু আছে এবং চোরাকারবারের বাড় বাড়ন্ত রয়েছে সেইজন্য নেপালেও ভারতীয় জাল নোটের কারবার রমরমিয়ে চলছে। পুলিশ সুপার জয়ন্ত কুমার পাল জানিয়েছেন বৈষ্ণবনগর ও চাঁচলে জাল নোটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পাওয়া গেছে। তবে জাল নোট উদ্ধারে সাফল্য পেলেও এ ব্যাপারে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছে জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশ বলছে তারা চলতি বছরে প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে এবং গ্রেফতার হয়েছে ১৫৬ জন (যার ৯৯ শতাংশ মুসলিম) পাচারকারী। বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর। দেশের অর্থ নীতিকে পঙ্গু করতে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা নিয়ে বাংলাদেশীরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকছে। এক লক্ষ টাকার জাল নোট এজেন্টকে দিতে পারলে ৪০ হাজার টাকা আসল নোট তারা পাবে। মালদা জেলার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জ্বল চৌধুরী জানিয়েছেন আমরা এখন ৫০০ এবং ১০০০ টাকা নিতে ভয় পাচ্ছি। এছাড়া টাকাগুলি এত উন্নত ভাবে ছাপা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ কোনটা জাল নোট এবং কোনটা আসল নোট পার্থক্য করতে পারছে না। ইতিমধ্যে কত কোটি জাল টাকা যে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তার হিসেব করা মুস্কিল। তাই জেলা প্রশাসন যদি কড়াকড়ি ব্যবস্থা না নিতে পারে তবে দেশে যে জাল টাকায় ছেয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত জাল নোটের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর মুসলিম বিভিন্ন চিটফান্ডের কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েও মানুষের সর্বনাশ করছে। কালিয়াচক থানার একটি মসজিদের পাশে 'বর্তমান প্রোজেক্ট লিমিটেড' নামে একটি চিটফান্ড ২০১১ সাল থেকে চালু করে। গত ১৩ ডিসেম্বর ২৪ পরগণা থেকে ইউনুস আলি ও তার ছেলেকে পুলিশ ধরে। তারা টাকা ডবল করবে বলে নিয়ে পলিয়ে যায়। ৮০ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছিল বলে অভিযোগ। জেলায় এইরকম প্রচুর চিটফান্ড চলছে অথচ প্রশাসন চুপচাপ।

জাল নোটের জাল

- জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন পর্যন্ত সারাদেশে উদ্ধার হয়েছে ৩২.১৩ কোটি টাকার জাল নোট।
- কলকাতা পুলিশের এস টি এফ এবছর এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করেছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার জাল নোট।
- দেশের পুলিশ সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষে এস টি এফ।
- অন্যান্য এজেন্সি হিসাব করলে এবছর এ রাজ্যে উদ্ধার হওয়া জাল নোটের পরিমাণ ২ কোটি টাকার কাছাকাছি।
- ইউ এ পি এ প্রয়োগ হলে চার্জসিট দিতে ৬ মাস সময় পাবে পুলিশ। ততদিন জেলে আটক রাখা যাবে অভিযুক্তকে।
- অভিযোগ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন জেল।

অসুবিধা : সাধারণ নাগরিক না জেলেশুনে জালনোটের কারবারে জড়ালে তাঁর ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা। ধারার অপব্যবহারের আশঙ্কাও থাকছে।

ভোটের স্বার্থে বোড়োদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে গগৈ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে বোড়ো আন্দোলনকারীরা বৈদেশিক নীতি অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীদের শাস্তির দাবি করেছেন দেশের এবং তাদের ফেরত পাঠাতে বলেছেন নিজেদের দেশে। অসমের গগৈ সরকার এসব না করে অনির্দিষ্টকালীন সান্ধ্য আইন জারি করে কোকরাঝাড় অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যসরকারের এই দু'মুখো নীতির বিরুদ্ধে 'জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ' নিন্দা প্রকাশ করেছে। বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থ বড় করে দেখার জন্য রাজ্য সরকার এদেশের বোড়ো জনজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে চলেছে। এর ফলে মুসলমান অপরাধীরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে এবং এদেশের জনজাতিদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এতে এদেশে জমি ও মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। বোড়োদের সম্পর্কে কথা বলে সুরক্ষা মঞ্চ দাবি করেছে— অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলকে। যিনি বোড়োদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছেন অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের। যা রাষ্ট্রীবিরোধী বলা চলে। মুসলমানদের ভোট যাতে শুধুমাত্র কংগ্রেস পায় তার জন্যেই এত অঙ্ক কষে প্যাঁচ তৈরি চলেছে। আর সেজন্যেই চলেছে স্বদেশের বোড়োদের উপর অত্যাচার এবং বিদেশী মুসলমানদের সুরক্ষা আর স্বস্তির জন্যে সুব্যবস্থা। বোড়ো এলাকায় ফৌজি অভিযান বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা।

মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের খুশি করার জন্যে কংগ্রেস সরকার বোড়ো হিন্দুদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চালাচ্ছে। জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ একথা জানিয়েছে লিখিতভাবে সংবাদ মাধ্যমকে। মঞ্চের সচিব শ্রীজলেশ্বর ব্রহ্ম বলেছেন, রাজ্যসরকার মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্যে বোড়ো হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। বোড়ো প্রধান অঞ্চলে বোড়ো দমন কর্মসূচি নিয়ে ২০ হাজার নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে। অত্যাচারের কোনও প্রত্যক্ষদর্শী যাতে না থাকে সেজন্যে বোড়ো অধ্যুষিত এলাকা জনশূন্য করা হয়েছে। অসমের তরুণ গগৈ সরকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এর কারণ বোড়ো নেতারা প্রতিবাদ করেছেন রাজ্য সরকারের বোড়ো নীতির বিরুদ্ধে। শ্রীব্রহ্ম জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার বোড়োদের দাবিদাওয়াকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের বদলে তরুণ গগৈ সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশী মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কয়েক লক্ষ অভিযোগ জমা হয়েছে রাজ্যপ্রশাসনের বিরুদ্ধে। প্রধান অভিযোগগুলি হলো—

১. ফৌজের শক্তির অপব্যবহার করে বিদেশি মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে।

২. বোড়ো গ্রামবাসী ও নেতাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩. বোড়োদের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে।

৪. অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এদের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল— 9874398337 / 8820329463

❁ গ্যাংটক–নামচি–পেলিং–ইয়ুমথাং ❁ দার্জিলিং ❁ পুরী
❁ সিমলা–কুলু–মানালী ❁ কাশ্মীর ❁ ভাইজ্যাক–আরাকু
❁ দিল্লি–আগ্রা–মথুরা–বৃন্দাবন–হরিদ্বার–মুসৌরী
❁ কেরালা ❁ গোয়া ❁ মুম্বাই ❁ আন্দামান
❁ দেওঘর ❁ সুন্দরবন ❁ সিমলীপাল
❁ শিলং–চেরাপুঞ্জি–গৌহাটি

প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলাদেশের আয়নায়

বাংলাদেশে হিন্দুদের মনোবল এখনও অটুট

শিবগঞ্জ বাজারে মন্দির।

বাংলাদেশ থেকে ফিরে তরুণ কুমার পণ্ডিত ॥ জন্মস্থান দেখার টানে গত ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশের শিবগঞ্জের কানসার্ট-মোহনবাগ-এ গিয়েছিলাম। এক সময়ে এই এলাকা মালদা জেলারই একটি থানা ছিল। ১৯৬২ সালে ২ বছর বয়সে এপারে এসেছিলাম। তারপর দীর্ঘদিন পর প্রতিবেশী আশোক সাহার সঙ্গে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের জন্মস্থানে পৌঁছালাম। মহদীপুর আন্তর্জাতিক বর্ডার দিয়ে পার্সপোর্ট-ভিসা পরীক্ষা করে ওপারে পৌঁছে আমাদের অটোর মতো দেখতে মুসুক যানে চেপে শিবগঞ্জ পৌঁছালাম। সেখানে আমাদের অতিথি আপ্যায়নের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সকাল ১০টায় বাড়ি থেকে রওনা হয়ে ১২ টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাওয়াতে আশ্চর্য হলাম। দুপুরের ভোজন সেরে একটু বিশ্রাম। তারপর ভাই তন্ময়ের সঙ্গে মোটর সাইকেলে সামান্য দূরে তত্ত্বিপুর মহাশ্মশান দেখতে গেলাম। শুনলাম শ্মশানের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ হিন্দুদের মৃত্যুর পর দাহ করার জায়গা থাকবে না। হিন্দুরা শ্মশানের জমির জন্য আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুটা সফল হয়েছে। এরপর শিবগঞ্জ বাজারে দুটি মন্দির দেখলাম। যেগুলি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বিবর্ণ এবং ভগ্নপ্রায়। মন্দিরের ভেতরে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ।

কানসার্টে রাজার বিশাল অট্টালিকা বা প্রাসাদ দেখলাম। যেটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০ বিঘে জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেটিরও ভগ্নদশা। ইট কাঠগুলি খসে খসে পড়ছে এবং চামচিকা ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল। পুকুরিয়া থেকে কানসার্ট যাওয়ার পথে এরকম আরও দুটি মন্দির চোখে পড়ল যেগুলি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেহেতু আশেপাশে হিন্দুরা বসবাস করে না এবং মন্দিরটিও দেবোত্তর সম্পত্তি নয়, সুতরাং কিছুদিন পর সেটি অবশ্যই অন্যের দখলে চলে যাবে। সারা বাংলাদেশ খুঁজলে এরকম হাজার হাজার মন্দির পাওয়া যাবে যেগুলিতে ধুমধাম সহকারে এক সময়ে পুজো হোত। কিন্তু হিন্দুরা এপারে চলে আসার সময়ে কাগজে-কলমে সেটি মন্দির বলে উল্লেখ করে আসেনি। সুতরাং সেগুলি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। অথচ ভারতে হিন্দু এলাকাতে মসজিদ থাকলেও সেটি দখল হওয়ার কোনও ভয় নেই। ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম ওই তত্ত্বিপুর মহাশ্মশানে ৭ দিন ধরে মেলা বসত। এখন বসে না। তবে কানসার্টে গঙ্গার ধারে এখনও মাঘী পূর্ণিমাতে মেলা বসে। কিন্তু সেই আনন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মেলে না।

সেই নদীর ধারে একটি গঙ্গাশ্রমের জায়গা দখল নিয়েও হিন্দুদের সঙ্গে ঝামেলা চলছে। দেখলাম প্রাচীন নিম গাছের নীচে দাদু-দের (মার বাবা) প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরটি রয়েছে। কিন্তু নিম গাছটি কাটা হবে বলে ঠিক হয়েছে। ক্লাবের সঙ্গে এই নিয়ে ঝামেলা চলছে। মালদার মনমোহন সাহা-র কার্তিক পূজাতে বিরাট মেলা বসে ফুলবাড়িতে। সেই মনমোহন সাহার বাংলাদেশে পুকুরিয়াতে বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং সেই অট্টালিকার কারুকার্য করা সুদৃশ্য খিলান দেখে মুগ্ধ হলাম। যাঁরা তাদের এই পৈত্রিক ভিটে কেনে তারা এপারে চলে এসেছিল অথচ সেগুলি এখন অন্যের দখলে। ভাবতে কেমন লাগে! ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে বছর স্বাধীন হয় তখন যেসব হিন্দুরা মানসম্মান ও প্রাণের ভয়ে একবস্ত্রে ভারতে চলে এসেছিল, স্বাধীনোত্তর কালে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে তারা আর বাড়ির কোনও আসবাবপত্র বা অন্য কিছু তো পায়নি, অনেকের বাড়িটিও প্রতিবেশী মুসলিমরা দখল করে নিয়ে দিব্যি বসবাস করতে শুরু করেছিল। পরে বাড়ির একটা ঘর হয়তো অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পেয়েছে। তবে এর মাঝেও হিন্দুরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে পূজা ও মেলার মাধ্যমে। এইরকম একটি বহু প্রাচীন শ্রীশ্রী খেতুরী প্রেমতলীর মেলা দেখার

সৌভাগ্য হলো। রাজসাহী থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে এই মেলাতে হাজার হাজার হিন্দুরা শ্রীল নরোত্তম দাসঠাকুরের আকর্ষণে ছুটে আসে। প্রত্যেক বছর লক্ষ্মীপূজার পাঁচদিন পর অর্থাৎ কার্তিক মাসের শুক্লা-পঞ্চমীতে খেতুরীতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগে মেলা এক মাস ধরে অনুষ্ঠিত হোত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য

খেতুরী প্রেমতলীর মেলা।

সম্প্রদায়ের ভক্তগণও এখানে এসে অপ্রাকৃত অনন্দলাভ করে থাকেন। বর্তমানে এই মেলা ৩-৪ দিন মাত্র হয়। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম দেখার মতো। যদিও আমি সে সময় মেলাতে উপস্থিত ছিলাম। নিম্নচাপের ফলে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল এবং সারাদিন ধরেই বৃষ্টি পড়ছিল। এই দুর্যোগের মধ্যেও হাজার হাজার তীর্থযাত্রীকে বৃষ্টিতে ভিজে মেলাতে উপস্থিত হতে দেখা গেল। এই নরোত্তম দাস যাঁর নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও ছুটে আসেন তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে নাম ছিল কৃষ্ণানন্দ দত্ত। এক মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার পুত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর টানে নরোত্তম দাস সংসার ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে চলে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন দেহত্যাগ করেছেন। কিছুদিন পর স্বপ্নে নরোত্তমদাস আদেশ পান— লোকনাথ গোস্বামীর কাছে তিনি যেন দীক্ষা নেন এবং সংকীর্তনে সারাজীবন প্রেমতলী ও খেতুরীতে কাটান। প্রেমতলীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদার্পণ ঘটেছিল। তাই এই স্থান বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছে আজও পবিত্র। শিবগঞ্জ ফিরে আসার সময় বাসে বাংলাদেশের হিন্দুদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ লক্ষ্য করলাম। যে বাসটিতে উঠেছিলাম তাতে এক মুসলিম যাত্রী বসন্ত সরকার বলে একজন হিন্দু যাত্রীকে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলল, আপনারা কি মেলাতে পাপ ধুতে গিয়েছিলেন? আর যায় কোথায়— সেই বসন্ত সরকার রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, তাহলে আপনারা মক্কাতে হজ করতে যান কী পাপ ধোয়ার জন্য? পাশের লোকজন মুসলিম যুবকটিকে ধমক দিল, 'তোমার এরকম বলা উচিত হয়নি'। আমি শুনছিলাম। বাংলাদেশে হিন্দুদের মনোবল এখনও অটুট রয়েছে। এই তো সিংহের বাচ্চা। বাংলাদেশে অবস্থানকালে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। তারা ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে। হিন্দুদের উপর কোনও প্রকারে আঘাত আসলে তারা ভারতের কাছে একটু প্রতিবাদ আশা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য— আমরা তাদের এইটুকুরও সমবেদনা জানাতে পারি না।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান

স্বস্তিকা

প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা

বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫্ টাকা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

মমি দেখতে মিশর নয়, হিমাচল চলুন

বিরাজ রায়॥ এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের গোচরে আসে না। তেমনি ভারতেও যে মমি আছে তা কি কোনওদিন ভেবেছেন? মমি মানেই তো মিশর; কিন্তু ভারতে...! অবাক

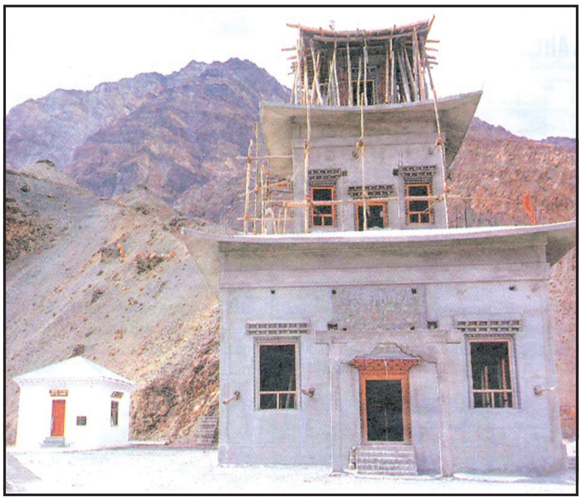

গিয়ু-তে 'মমি' মন্দির।

হচ্ছেন তো? হ্যাঁ, হিমাচলপ্রদেশের গিয়ু (Gue) নামে এক গ্রামে রয়েছে সাড়ে পাঁচশো বছরের পুরনো একটি মমি। যা সাড়া ফেলেছে ভ্রমণ-পিপাসুদের মধ্যে। ভারত-চীন সীমান্তের মাইল খানেক ভিতরে হিমাচলপ্রদেশের স্পিতি ভ্যালি (Spiti Valley)-র ছোট্ট গ্রাম— গিয়ু। সেখানকারই একটি মন্দিরে কাঁচের ভিতর সংরক্ষিত আছে এই মমি। স্থানীয়দের কাছে তা 'মমি লামা' নামেই পরিচিত। তাদের মতে, প্রাচীন এই মমিটি একজন সন্ন্যাসীর এবং স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি দেবতুল্য। এই সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে একজন সেনাকর্মী ছিলেন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। তাই তিব্বত পুলিশদের কাছে ওই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র। সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এরকম আরও অনেক মমি আছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

হাজার বছরের পুরনো টাবু মনাস্টেরী (Tabu Monastery) থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই মমিটি প্রথম নজরে আসে ভূমিকম্পে সমাধির ছাদ ভেঙে পড়ার পর। কিন্তু তখন সেটা কেবলমাত্র সেনাদের দর্শনের জন্যই খোলা থাকতো। পরবর্তীতে মমিটিকে সরিয়ে বর্তমান জায়গায় নিয়ে আসা হয় এবং সবার জন্যই খুলে দেওয়া হয়। পবিত্র এই স্থানটির নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সেনারাই করে থাকে। কয়েক বছর আগে নিরাপত্তার জন্য মন্দিরের চারিদিকে খাল কেটে একটি পরিখাও তৈরি করে দেয় ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (ITBP)।

এক সময় মমিটি মন্দির থেকে চুরি হয়ে সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তৎপরতায় মমিটি আবার ফিরিয়ে আনা হয়। তখন থেকে গিয়ু-গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষরাই মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এখন অধিকাংশ সময়ই মন্দিরের দরজা তালাবন্ধ থাকে। দর্শনার্থীদের জন্য কেবলমাত্র পাশের একটি জানালা খোলা আছে। তা দিয়েই অস্পষ্ট ভাবে মমিটি দেখা যায়। তবে ছত্রাক থেকে মমিটিকে বাঁচাতে স্থানীয়দের দেওয়া ঘেরাওটি খুলে দেওয়া হয়েছে। যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। মমির গায়ে কোনও সুগন্ধি দ্রব্য লাগানো যাবে না, এছাড়া সেখানে রাখা চুল, নখ ও দাঁতের সংরক্ষণের জন্য তারা সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। এই বিষয়টি দেখার জন্য সম্প্রতি হিমাচলপ্রদেশ সরকার পর্যটন দপ্তরকে দায়িত্ব দিয়েছে। মমিটিকে টিকিয়ে রাখতে চার লাখ টাকার একটি প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে। ওই মন্দিরের পাশেই তৈরি হচ্ছে বিশালভাবে আরও একটি মন্দির।

এবার সরকারি উদ্যোগে পুরনো মমি উদ্ধারের কাজও যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে হয়তো আর একটি মিশর উঠে আসবে হিমাচলে।

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯

Email : banbhoomitravels@gmail.com

বিবেকানন্দ
যুব শিবির : ২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩

অংশগ্রহণের বয়স ১৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত

১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

স্থান : গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া

সৌজন্যে—

আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের অভিজ্ঞতায়

স্বদেশীর পথে স্বদেশে ফেরা

লেভিন অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড

(স্বদেশী চিন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ)

সুস্থ জীবনের রহস্য—মুদ্রা

আশীষ পাল

আমরা দেখেছি গৌতম বুদ্ধকে গৃহত্যাগ করতে, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। পৃথিবীতে মানুষ যত দুঃখ পায়, রোগ তার প্রধান কারণ। কিন্তু রোগ কি জন্য হয় তা না খুঁজে আমরা মরীচিকার মতো অন্য দূরের জিনিসের উপর খোঁজখবর করি, যেমন ইংল্যান্ডের নদ-নদী ও পাহাড়ের নাম আমাদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিজ দেশ ও জেলার বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই। আমরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির সংবাদ রাখি কিন্তু আমাদের দেহটি একান্ত কাছের, তার সম্পর্কে আমাদের খুব কমই জানা আছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতবর্গ জানানোর চেষ্টা করেন না বা করান না। অথচ এই পৃথিবীতে দেহই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সকলে দেহখানিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু কেমন করে ভালোভাবে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারি তা জানি না। আমরা দেখি যে যন্ত্র চালায়, তার যন্ত্র সম্পর্কে অনেক জ্ঞান থাকে কিন্তু দেহনামক যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমরা জানি না দেহটি কেমন ভাবে সুস্থ রাখা যায়। আমাদের দেশে মুনি-ঋষিরা অনেক সাধনা করে শরীরকে সুস্থ ও সবল করার এমনকী দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। যেমন, আসন, প্রাণায়াম, আকু প্রেসার, মুদ্রা ইত্যাদি। তার মধ্যে মুদ্রা সম্পর্কে অনেকে জানেন না, সেই সম্পর্কে আজ জানবো। এই চিকিৎসা পদ্ধতি নিঃশুল্ক। প্রাণায়াম করার সঙ্গে মুদ্রার বিশেষ সম্পর্ক আছে। এটা এমন চিকিৎসা যা আঙ্গুলের দ্বারা করা হয়ে থাকে। আমরা জানি হাতে এমন বিশেষ প্রকার শক্তি প্রবাহিত হয় যা আঙ্গুলের দ্বারা প্রকাশ পায়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা নির্মিত। আমাদের শরীরও পঞ্চতত্ত্বে তৈরি। এই পাঁচতত্ত্ব শরীরের পাঁচ আঙ্গুল প্রতিনিধিত্ব করে। বৃদ্ধাঙ্গুলি— অগ্নিতত্ত্ব, তর্জনী— বায়ু তত্ত্ব, মধ্যমা—

আকাশ, অনামিকা— পৃথিবী এবং কনিষ্ঠা— জল তত্ত্বের প্রতিনিধি। এই পাঁচ তত্ত্বের ভারসাম্য ঠিক থাকলে মানুষ সুস্থ থাকে। পাঁচতত্ত্বের ভারসাম্য নষ্ট হলে রোগের প্রকট হয়। বিভিন্ন মুদ্রার দ্বারা পাঁচতত্ত্বের ভারসাম্য ঠিক করা হয়।

পাঁচ তত্ত্বের আধ্যাত্মিক অর্থ হলো— বৃদ্ধাঙ্গুলি— ব্রহ্মার প্রতীক, তর্জনী— জীব-এর প্রতীক, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা আঙ্গুল ত্রিগুণাত্মক-এর প্রতীক (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ)। অঙ্গুলি এবং অঙ্গুলিগুলো স্পর্শ করলে তত্ত্ব সন্তুলিত হয়। অঙ্গুষ্ঠার মূলে অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা দাবালে তত্ত্ব কমে। ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত মুদ্রা করা যেতে পারে। রোগ সেরে গেলে মুদ্রা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে অনেক সময় হানির সম্ভাবনা আছে। কিছু কিছু মুদ্রা অধিক সময় ধরে করা যায় যেমন— জ্ঞান, পৃথিবী, আপান, প্রাণমুদ্রা।

পাঁচ তত্ত্বের প্রতিনিধি কোন কোন আঙ্গুল তা চিত্রে দেখানো হলো।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো আঙুল)— সূর্য বা আগুনের প্রতীক।

তর্জনী (নির্দেশক আঙুল)— বাতাস বা বায়ুর প্রতীক।

মধ্যমা (মাঝের আঙুল)— মহাকাশের প্রতীক।

অনামিকা (অঙ্গুরীয়)— পৃথিবীর প্রতীক।

কনিষ্ঠা (কড়ে আঙুল)— জলের প্রতীক।

মুদ্রা শুরু করার আগে যে যে বিষয়ের উপর নজর দেওয়া উচিত—

- ভোজন করার পরে কোন মুদ্রা করা উচিত নয়।
- ডান হাতে মুদ্রা শরীরের বাঁ দিকের এবং বাঁ হাতের মুদ্রা শরীরের ডান দিকের ভারকে প্রভাবিত করে।
- যদি শরীরের একদিকে কষ্ট হয় তা হলে বিপরীত ভাগের সমন্বিত মুদ্রা এবং অন্য হাতের প্রাণমুদ্রা করতে হবে। প্রাণমুদ্রা আমাদের জীবনী শক্তি বাড়ায়। আর রোগকে তাড়াতাড়ি দূর করার ক্ষমতা রাখে।
- একই সঙ্গে দুটো মুদ্রা করা যেতে পারে।
- এক মুদ্রা শেষ হওয়ার পরে অন্য মুদ্রা করা যেতে পারে কিন্তু বিপরীত প্রভাব যুক্ত মুদ্রা না হয়।
- ছোট শিশু এবং কমজোর ব্যক্তি এবং আপতকালীন স্থিতিতে টেপ লাগাতে পারেন।
- বেশির ভাগ মুদ্রা উঠতে বসতে, হাঁটতে, চলতে, কথা বলতে, অবসর সময়ে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি লম্বা শ্বাসের সঙ্গে করা যায় তাহলে বিশেষ লাভ পাওয়া যাবে।
- মুদ্রা করতে করতে যদি কোনও কষ্ট মনে হয় তাহলে মুদ্রা করা উচিত নয়।

বনগাঁ সীমান্তে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহোৎসব

গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর বনগাঁ সীমান্তে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাজিৎপুর শাখা আয়োজিত বাৎসরিক মহোৎসব এবং বৈদিক বিশ্বশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। দূর-দুরান্ত থেকে আগত হিন্দু নরনারীর এক বিশাল মিলন মেলা

হয়ে উঠেছিল এই মহোৎসব।

প্রথমদিন ছিল আচার্য গুরুমহারাজের বরণ ও পূজা অনুষ্ঠান। দুপুরে এক বিরাট বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা। প্রায় ৫ হাজার নরনারী এত অংশগ্রহণ করে সীমান্তের বহু গ্রাম পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রায় ছিল গুরুমহারাজ স্বামী প্রণবানন্দের প্রতিকৃতিসহ দেব-দেবীর মূর্তি। চলছিল মায়েদের জয়ঘোষ, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি। সেই সঙ্গে জনজাতি ছাত্রদের অনুষ্ঠান। পরদিন সকালে হরিনাম সংকীর্তন ও বৈদিক বিশ্বশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান। সন্ধ্যায় হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের স্বামী ত্যাগত্মানন্দজী, গয়ার স্বামী সুধাময়ানন্দ, বালিগঞ্জ থেকে স্বামী বিজয়ানন্দ ও স্বামী পরিত্রানন্দজী, দুর্গাপুর থেকে স্বামী আত্মাস্থানন্দজী, স্বামী সারস্বতানন্দজী। স্বামী ত্যাগানন্দজী সমাজের শিক্ষিত মানুষদের সমাজ সেবার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মূল সংগঠক ছিলেন সুভাষ মহারাজ।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ শিবির

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবির সম্প্রতি হয়ে গেল। এই পর্যায়ে ৫টি শিবিরে মোট ১৯৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিবিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম—

(১) **উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ সারদা শিশুতীর্থ :** শিক্ষার্থী-৩৩, শিক্ষিকা-৩, কার্যকর্ত্রী ও প্রবন্ধিকা-৯, মোট-৪৫। উদ্বোধন করেছেন কল্পনা রায়।

(২) **ভ্যালাগাছি গ্রাম :** ৩০ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। শিক্ষার্থী-৩৫, শিক্ষিকা-৩, কার্যকর্ত্রী ও প্রবন্ধিকা-৭, মোট-৪৫। উদ্বোধন করেছেন জয়া সরকার।

(৩) **শান্তিপুর সারদা শিশুতীর্থ :** ৪ নভেম্বর বেলা ১০টা থেকে ৮ নভেম্বর সকাল ৭টা পর্যন্ত। শিক্ষার্থী-৪৫, শিক্ষিকা-৪, প্রবন্ধিকা ও কার্যকর্ত্রী-১১। মোট-৬০। উদ্বোধন করেছেন শুক্লা মজুমদার। এখানে পথসঞ্চলন হয়।

(৪) **দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দির :** ৩১ অক্টোবর বিকাল তিনটা থেকে ৩ নভেম্বর সকাল ৭টা পর্যন্ত। শিক্ষার্থী-২৫, শিক্ষিকা-৩, প্রবন্ধিকা ও কার্যকর্ত্রী-৯। মোট-৩৭। উদ্বোধন করেন মিতা মুখোপাধ্যায়।

(৫) **জলপাইগুড়ি জেলায় মোহিতনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় :** ৩১ অক্টোবর বিকাল ৪টা থেকে ৩ নভেম্বর সকাল ৭টা পর্যন্ত। শিক্ষার্থী-৬০, শিক্ষিকা-৫, প্রবন্ধিকা ও কার্যকর্ত্রী-৭। মোট-৭২। উদ্বোধন করেন রীণা সেন চৌধুরী।

সিউড়ীতে চক্ষু চিকিৎসা শিবির

সিউড়ী শহরের কাছে ছোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৯ ডিসেম্বর হলো চক্ষু চিকিৎসা শিবির। কলকাতা থেকে ছয়জন বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতমাতা ও বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের শুভ সূচনা করেন কবি ও সম্পাদক লক্ষ্মণ হাঁসদা। ডাক্তার বাবুরা ছাড়াও লক্ষ্মণ বিষ্ণু, সুরজিৎ সেনগুপ্তসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। প্রায় দুইশত পঞ্চাশজন চক্ষুরোগীর চক্ষু পরীক্ষা করে তাদের চশমা ও শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আগামী ৫ জানুয়ারি বিরসা মুন্ডা ক্লাব প্রাঙ্গণে ১০৮ জন চক্ষু রোগীকে তাদের চশমা দেওয়া হবে নিঃশুল্কভাবে। এবার বাকি রোগীদের ১৯ জানুয়ারি কলকাতা নিয়ে গিয়ে তাদের চক্ষুর শল্য চিকিৎসা করা হবে। বিরসা মুন্ডা ক্লাব এবং শ্রদ্ধা সংস্থা এই শিবির পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। এজন্য ধন্যবাদ জানান পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দে।

কলকাতায় শ্রীমদ্ হনুমান কথা যজ্ঞ

বিরাজ রায়॥ কলকাতার শহীদ মিনার

ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো শ্রীমদ্ হনুমান কথা জ্ঞান যজ্ঞ। শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির উদ্যোগে গত ১৬ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ট্রাস্টের সম্পাদক শ্রীমুরালভাই। সমাপ্তির দিন ব্যবহার ও সংস্কার বিষয়ে উপদেশ ও আশীর্বচন দেন স্বামী গোবিন্দদেব গিরিজী মহারাজ। সৎসঙ্গ সমিতির কার্যকর্তারা জানিয়েছেন— সাত দিনের এই অনুষ্ঠানে প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন।

ভারতে বনবাসী ও গিরিবাসী মানুষদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে বনবন্ধু পরিষদ। শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমেই তাদের স্বাবলম্বী করা সম্ভব। এই কথা জ্ঞান যজ্ঞ পরিষদের কাজকে আরও ব্যাপকতা এনে দেবে বলে জানিয়েছেন সমিতির সহ সম্পাদক রমেশ সরাওগি। বনবাসীদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সারাদেশে বনবন্ধু পরিষদ পরিচালিত প্রায় বাইশ হাজার একল বিদ্যালয় চলছে। শিক্ষক ছাড়াও সাড়ে পাঁচ হাজারের অধিক কার্যকর্তা পূর্ণসময় ধরে কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ১৫০০-রও বেশি একল বিদ্যালয় (ওয়ান টিচার স্কুল)।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে রামপুরহাট, ক্যানিং-এর মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও শতাধিক কার্যকর্তা যোগ দেন। কথাকার রাধাকৃষ্ণজী মহারাজ আহ্বান করেন--- ‘বনবাসীদের জন্য যে কাজ এগিয়ে চলছে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছোক যে, একল বিদ্যালয়ে পড়ে কেউ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে তা দেখতে পাই।’ প্রতিদিন বেলা দুটো থেকে ছটা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কথাকারেরা প্রবচন পাঠ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বুকস্টল ও একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মঙ্গলনিধি

উত্তর মালদা চাঁচলের সদরপুর শাখার স্বয়ংসেবক (কলকাতা পুলিশে কর্মরত) আনন্দ মণ্ডল তাঁর বিয়ে উপলক্ষে ১০০০ টাকা মঙ্গলনিধি উত্তর মালদা জেলা প্রচারক মথুরা চন্দ্র হেঁস ও জেলা কার্যবাহ দেবব্রত দাসের হাতে তুলে দেন।

শোকসংবাদ

পরলোকে মানিক চন্দ্র দাস

চলে গেলেন সুন্দরবন জেলার প্রাক্তন সহসঙ্ঘচালক মানিক চন্দ্র দাস। গত ১১ ডিসেম্বর সকালে বারুইপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, লেখক ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ‘স্বস্তিকা’র লেখকও ছিলেন।

***

মালদা জেলার ইংলিশ বাজার থানার কাঞ্চনতার শাখার স্বয়ংসেবক সমীর দাসের দাদা এবং সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী বরুণ কুমার দাসের ভাই স্বপন দাস ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র ও স্ত্রী-কে রেখে গেছেন। প্রসঙ্গত কলকাতার আরোগ্যভবনে থেকে দীর্ঘদিন তিনি চিকিৎসা করান।

***

সুন্দরবন জেলার বারুইপুর শাখার স্বয়ংসেবক পার্থ চৌধুরী-র মা প্রয়াত হয়েছেন। গত ১৩ ডিসেম্বর কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন।

গত ১০ ডিসেম্বর বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে সহকার ভারতীর রাজ্য শাখা আয়োজিত ‘সমবায় সম্মেলন’-এ ৪০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৫০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ৩০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীও এতে অংশ নেয়। উপস্থিতির ৭০ শতাংশই ছিলেন মহিলা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আর এস এসের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল ছাড়াও সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ও এই সম্মেলনের উদ্বোধক সতীশ মারাঠে, রাজ্য সভাপতি ডঃ তুহিন চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

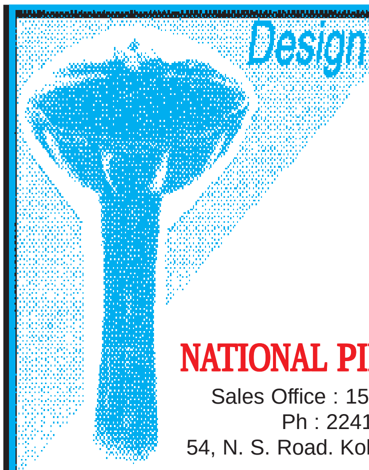

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

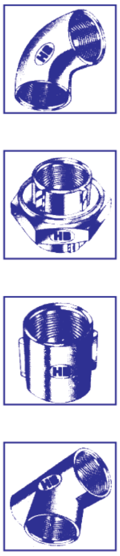

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
শাহী
গরম
মশলা
AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
Shahi Garam Masala
SUNRISE PURE ®
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

বছরের প্রাপ্তি আনন্দ ও অলিম্পিকে পদক

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ সাল থেকে ভারত একটা রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব অলিম্পিকে যাচ্ছে। ৮৮ বছরের ইতিহাসে এবছর লন্ডন অলিম্পিকের পারফরমেন্সই ভারতবর্ষের ক্রীড়া উৎকর্ষের প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম যদিও একটিও সোনা করায়ত্ত হয়নি। কিন্তু রূপো ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ৬টি পদক এসেছে দেশে। ২০১২-র এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর এ বছরের শেষলগ্নে এসে কলঙ্কিত ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা। দুর্নীতি ও বেনিয়মের দায়ে আই ও সি সম্প্রতি আই ও এ কে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছে। যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা অচিরেই এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। কিন্তু সাসপেনসনের আওতায় পড়ে যেভাবে মুখ পুড়েছে দেশের ক্রীড়া সমাজের, তার খেসারত কে দেবে?

অ্যাথলিট ক্রীড়াবিদরা একক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে ভারতকে লন্ডন অলিম্পিকে ৫০ তম স্থানে দাঁড় করিয়েছে। সুশীলকুমার, বিজয়কুমার রূপো আর মেরিকম, গগন নারাং, সাইনা নেওয়াল, যোগেশ্বর দত্তের ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তি আগামী ২০১৬-ব্রাজিল রাজধানী রিওতে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের সাপেক্ষে সোনালী দিক্চক্রবালের ইঙ্গিত বহন করছে। লক্ষ্মী মিত্তল ফাউন্ডেশন, সাহারা ইন্ডিয়ার মতো বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা আরও অর্থ লগ্নি করবে চাম্পিয়ন ট্রাস্টে। তাই আশাবাদী হওয়াই যায় রিওতে অন্তত ভারতীয় সোনার খরা দূর করবে, পাশাপাশি দশটি অলিম্পিক পদক জিতে ফিরবে। তার আগে ২০১৪-তে অনুষ্ঠিত হবে কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমস। এই দুটি আসরেই রিওর সাফল্যের ভিত্তি গড়ে দেবে। সবকিছুই অবশ্য নির্ভর করছে আইওসি-র সিদ্ধান্তের ওপর। যদি তারা ভারতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

এবছর ভারতের জাতীয় খেলা হকি সবদিক থেকে হতাশ করেছে। অলিম্পিকে যা কখনও হয়নি এবার তাই হয়েছে অর্থাৎ সর্বশেষ স্থান প্রাপ্তি। ন-বারের সোনাজয়ী ভারতের মুখ লুকোবার জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে না। অলিম্পিকের পর অবশ্য খানিকটা হলেও

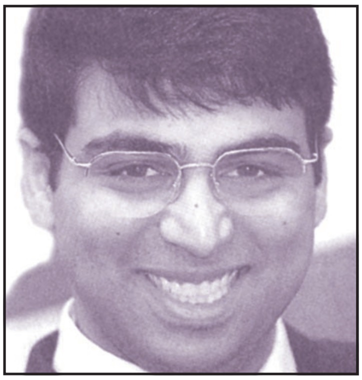

বিশ্বনাথন আনন্দ

আশার আলো দেখিয়েছে মেলবোর্নের চাম্পিয়নস ট্রফি হকি। সম্প্রতি মেলবোর্নের এই টুর্নামেন্টে মাইকেল নবসের কোচিং-পুষ্ট ভারতীয় হকি দল নিজস্ব উপমহাদেশীয় ঘরানার হকি খেলে আবার পাশ্চাত্য দুনিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচে জিতে সেমিফাইলে উঠে যায় ভারত। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়েও শেষরক্ষা হয়নি। ১৯৮২-তে লাহোর চাম্পিয়নস ট্রফিতে শেষবারের মতো ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। আর ওই বছরই মেলবোর্নে এসান্ড্রা মিনি ওয়ার্ল্ডকাপে রূপো জিততে সমর্থ হয়েছিল ভারত। বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের কোনও হকি টুর্নামেন্টে ওটাই শেষ বড় মুখ করে বলার মতো সাফল্য ভারতের।

ব্যক্তিগত ক্রীড়ায় এবছর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বিশ্বনাথন আনন্দের পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব খেতাব জয়। মে মাসে মস্কোতে বসেছিল বিশ্ব দাবার খেতাবি লড়াই। ইজরায়েলের হয়ে খেলা রুস গ্রান্ডমাস্টার বরিস সেলকান্ডকে সুপার টাইব্রেকারে হারিয়ে 'ভিশি' তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যান। তবে বিশ্ব খেতাব আর আনন্দ যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। অনেকটা সদ্যপ্রয়াত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্করের গ্রামি পুরস্কারের সঙ্গে তুলনীয় বিশ্ব দাবায় আনন্দের পরপর খেতাব জয়। যতদিন আনন্দ খেলবেন, ততদিন এরকম অজস্র আন্তর্জাতিক খেতাব তার মুকুটে উঠে আসবে। ইতিমধ্যে অস্কারও জিতেছেন ৫ বার। টেনিসে খাঁটি ভারতীয় কীর্তি ফরাসী ওপেনের মিক্সড ডাবলসে জিতে মহেশ ভূপতি ও সানিয়া মির্জার ট্রফি নিয়ে দাঁড়ানো। এই জুটির দ্বিতীয় গ্রান্ডস্লাম খেতাব এটি। এর আগে ২০০৯-এ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন। লিয়েন্ডার পেজ অবশ্য বিদেশী জুটি নিয়ে যথারীতি একটি গ্রান্ডস্লাম জিতে নিয়েছেন। আর একটির ফাইনালে উঠে রানার্স।

ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেওয়ালের অবশ্য বছরটি অলিম্পিক পদক ব্যতীত তেমন একটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এলেও বড় মাপের কোনও মাস্টার্স সহ বিশ্ব চাম্পিয়নশিপ অল ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টে নিজের মান ও মাত্রা ধরে খেলতে পারেননি। ২/৩টি মাঝারি মানের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট অবশ্য তাঁর হাত ধরে ভারতে এসেছে। তবে লি ক্যাশ্যপ পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি ও স্বপ্নের সঞ্চার করেছেন। বিশ্ব, অল ইংল্যান্ড দু-জায়গাতেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। এই ছেলেটি পরবর্তীতে প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুলেল্লা গোপীচাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে উঠতে পারেন। অন্যদিকে দলগত খেলার মধ্যে ফুটবলে নেহরু কাপ জয় অবশ্যই ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহৎ সাফল্য। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তলানিতে চলে যাওয়া ভারত শক্তিশালী ক্যামেরুনকে হারিয়ে কাপ জিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল সমাজে তরঙ্গ তুলেছে। বিখ্যাত ডাচ কোচ ও টেকনিকাল ডিরেক্টরদের হাত ধরে ভারতীয় ফুটবল নতুন বছরে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম করতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট দল নিজের দেশে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৮ বছর পর সিরিজ খুঁইয়েছে সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে।

শব্দরূপ-৬৫২ রাজর্ষি ঘোষ

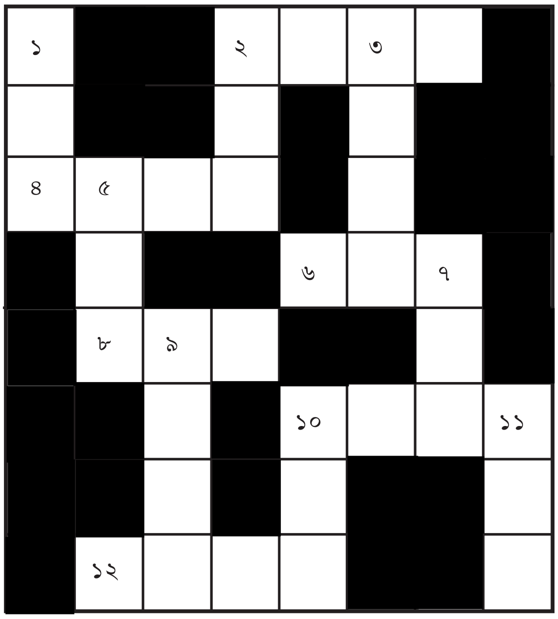

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. এই মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ ধরাশায়ী হয়েছিলেন, ৪. এই নক্ষত্রটি আকাশে জল-জন্তুর আকৃতির মত, প্রথম দুয়ে ঈঙ্গ বেবি, তিনে জননী, ৬. দেবীর এক মহাশক্তির রূপ, ৮. বিজয়া দশমীর উৎসব, ১০. নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য, ১২. বিশেষণে গোল গোল, দুয়ে-চারে পিতৃব্য।

উপর-নীচ : ১. ফুল ফল পাতার জন্য এক ধরনের লাঠি, ২. মহাদেব, ৩. সমুদ্র-মন্থন কালে দেবতারা এই সর্পকে মন্থন-রজ্জু রূপে ব্যবহার করেন, ৫. বিশেষণে কল্যাণকারী, ৭. জমি চাষ করার যন্ত্রবিশেষ, ৯. তৎসম শব্দে শিউলি ফুল, ১০. তৎসম নলখাগড়া, আগাগোড়া নিঃসঙ্গ, ১১. পাখা, বীজন।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪৯

অ	শৌ	চ		অ	ঙ্গ	সে	বা
ত্রি		কো	ট	না			
	অ	র		দি	ব্য	চ	ক্ষু
	শো					ন্দ্র	
	ত্রি					মৌ	
জ	য়	দ্র	থ		ব	লি	
			ম	য়া	ল		ঋ
পু	ণ্ড	রী	ক		দ	র্প	ক

সঠিক উত্তরদাতা

সৈকত দত্ত রায়
শিলচর, অসম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৫২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়

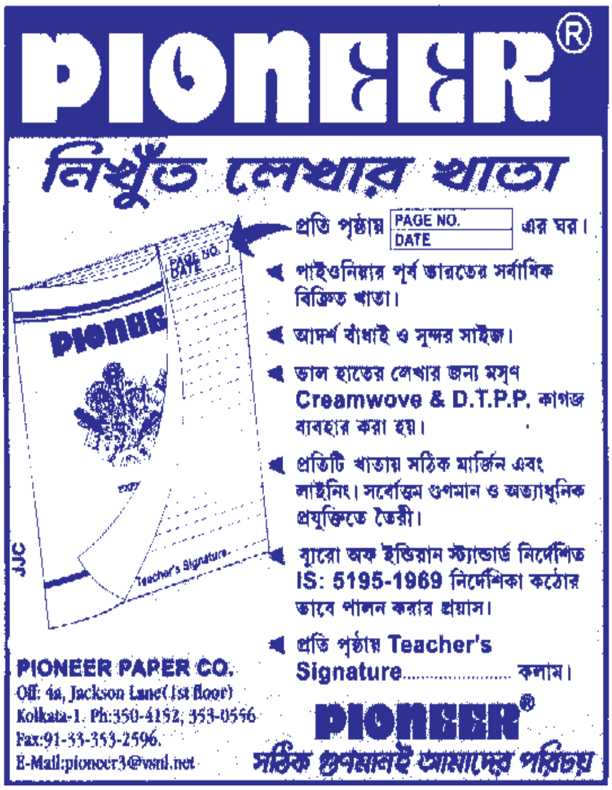

"সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়"

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২৪

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

মাছ ধরার নৌকো সৌরশক্তিতে চালাবার উদ্যোগ চলেছে

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ গভীর সমুদ্রে যাঁরা মাছ ধরতে যান তাঁদের সারা বছরই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় যথেষ্ট। সমুদ্রের জলের চরিত্র তারা জানেন। বছরের কোন্ কোন্ সময়ে প্রকৃতি কেমন রূপ নেয় তা জেনেছেন তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে। মাছ ধরাই তাঁদের জীবিকা। জলের শস্য বলা হয় ইলিশকে। যেসব সামুদ্রিক মাছ জালে ধরা পড়ে তার সবটা তাঁরা তীরে আনতে

পারেন না। কারণ জলযানে যত খুশি মাছ তোলা যায় না। অতিরিক্ত ভার নিয়ে তটে ফেরা কঠিন। তাছাড়া প্রচুর মাছ ধরলেই তার ক্রেতা মিলবে না। মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মাত্রা ছাড়ানো যোগান হলে রাখা মুশকিল। বাজারেও ভারসাম্য রাখা সম্ভব হবে না। মৎস্যজীবীরা লুঠেরা নন। একদিনে যত পারি তুলে সরে পড়া তাদের অভীষ্ট হয়নি কখনও। কারণ তাঁদের মাছের খোঁজে গভীর সমুদ্রে যেতে হবে রোজই। নিয়ম মেনে না চললে বিপদ আসতে পারে যে কোনও সময়ে। আগে মৎস্যজীবীরা ভরসা করতেন কমজোরি দাঁড় টানা নৌকোর উপর। খুব বেশি দূরে যেতে পারতেন না তাঁরা। যতটা যেতেন তার মধ্যে ঝুঁকি থাকত।

এখন প্রত্যেক জলযানে যন্ত্র লাগানো রয়েছে। দাঁড় টানতে হচ্ছে না। দ্রুতগামী আধুনিক মাছ ধরা নৌকো চলে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে। আমাদের দেশের সমুদ্রের অনেক জায়গাতেই মৎস্যজীবীরা মাছ ধরেন। অনুমতি তাঁদের রয়েছে। তাঁদের জলযানগুলো চলে যে যন্ত্রে তা চালু রাখার জন্যে জ্বালানি লাগে। তার পরিমাণ কম নয়। মাছ ধরার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হয় তার ৭০ শতাংশ জ্বালানিতে খরচ হয়ে যায়। মৎস্যজীবীরা জলযানের ইঞ্জিন বন্ধ করতে চান না। একটিই ভয় থাকে, যদি আবার চালু না করা যায় তাহলে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি লাগছে। আর জ্বালানি ব্যবহারের ফলে দূষিত হচ্ছে সমুদ্রের জল। মাছেরও ক্ষতি হচ্ছে তাতে। অনেক মৎস্যজীবী পোড়া তেল জলে ফেলে দেন।

প্রযুক্তিবিদ ও প্রশাসন আধিকারিকদের নজরে পড়েছে ব্যাপারটা। জলযানের জন্যে জ্বালানির খরচ বেড়ে চলেছে। জ্বালানির খরচ সামলানো কঠিন হচ্ছে। কয়েক শো জলযান মাছ ধরতে বেরোয়। বিভিন্ন মৎস্যবন্দর থেকে। কাজ শেষে ফিরে আসতে কয়েক ঘণ্টা লাগে। একটা মাছধরা নৌকোর জ্বালানি লাগে দিনে ৩০ লিটার। বছরে কি পরিমাণ তেল লাগে এর থেকে অনুমান করা যায়। এই জ্বালানির দাম কয়েক লক্ষ টাকা। প্রযুক্তিবিদরা পরামর্শ দিচ্ছেন। তেলের বদলে সৌরশক্তি ব্যবহার করলে খরচ সাশ্রয় সম্ভব। সমুদ্রে বিনা বাধায় পাওয়া যাবে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ। বিভিন্ন জলযানের ছাদে সৌরশক্তি তৈরির ব্যবস্থা করা যায়। যে পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি হবে তাতে কয়েকঘণ্টা জলযানের ইঞ্জিন তেলের বদলে সৌরশক্তিতে চালানো সম্ভব। প্রযুক্তিবিদরা বলছেন, ওই পদ্ধতি চালু করতে প্রথম পর্যায়ে কিছু অর্থ ব্যয় হবে ঠিকই, কিন্তু যে পরিমাণ জ্বালানি সাশ্রয় হবে তা বছর শেষে যোগ করলে দাঁড়াবে যথেষ্ট। এক একটি জলযান ছ-ঘণ্টা সৌরশক্তিতে চললে তেলের পরিমাণ কম লাগবে। মৎস্যজীবীদের কাছে এটা অত্যন্ত সুখের সংবাদ। তেলের জন্যে ৫৮০টা জলযানে খরচ ২২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এই খরচ কমানো গেলে মৎস্য ব্যবসার সামগ্রিক চেহারা সবদিক থেকে অন্যরকম হবে। পরীক্ষামূলক ভাবে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি এলাকায় সৌরশক্তি চালিত জলযান সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। সাফল্য দেখা দিলে দেশের সর্বত্র সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবীরা সৌরশক্তি চালিত জলযানে আগ্রহী হবেন আশা করা যায়। জ্বালানি সাশ্রয় হলে মাছের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। ব্যবসায় ঝুঁকি কমবে। সমুদ্রে দূষণের হারও কমে যেতে বাধ্য।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
31 December - 2012

দাম : ৭.০০ টাকা